বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

পঞ্চম সংস্করণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় •

১৯৫৬

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বিজ্ঞপ্তি	।/০
সাঙ্কেতিক চিহ্ন	৶/০
বাঙলা ভাষা আর বাঙালীজাতের গোড়ার কথা	১
বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ সঙ্কলন	৫০
স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি	৬৫
বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৮৭
বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১১৮
মহাপ্রাণ বর্ণ	১৬১

বিজ্ঞপ্তি

(প্রথম সংস্করণ)

বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় কলেজের ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী হইবে বিবেচনা করিয়া ১৩৩৩ সালে ও ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত দুইটী প্রবন্ধ পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইল।

প্রথম প্রবন্ধটী ১৩৩৩ সালে শ্রাবণ ও আশ্বিন সংখ্যায় সবুজ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়, ১৩৩৫ সালের তৃতীয় সংখ্যায়।

প্রথম প্রবন্ধটী চলিত ভাষায় লিখিত। ভাষাগত ক্রিয়াপদ প্রভৃতি তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দের বানান, উপস্থিত অবস্থায় যতদূর সম্ভব, বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ও প্রকৃতির অনুমোদিত করিয়া লিখিবার প্রয়াস করিয়াছি। চলিত ভাষায় একটী শব্দের বানান-সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ আবশ্যক হইয়াছে: 'নোতুন' শব্দ। সাধারণতঃ ইহাকে 'নতুন'-রূপে বানান করা হয়। এই শব্দটীর প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ হইতেছে: 'নৌতুন': ঔ-কারযুক্ত এই রূপ হিন্দীতে এখনও প্রচলিত আছে। 'নৌতুন' হইতে আধুনিক বাঙ্গালা চলিত ভাষায় 'নোতুন' বা 'নতুন'—সংস্কৃত 'নূতন' শব্দের আধুনিক উচ্চারণ-বিকারে নহে। বাঙ্গালার প্রাকৃতজ ও অর্ধতৎসম শব্দের বানান-সম্বন্ধে ছাপার অক্ষরের প্রচলনের যুগ হইতেই বাঙ্গালী লেখকেরা একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া পড়ায়, এইরূপ শব্দ-সম্বন্ধে বানান-বিষয়ে যথেচ্ছাচার চলিতে থাকে; এবং এইরূপ শব্দের উৎপত্তি ও ইতিহাস বহু স্থলে জানা না থাকায়, খুশী-মত ব্যাখ্যা করিয়া ইহাদের উচ্চারণ এবং রূপ-ও বদলাইবার দিকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটা সজ্ঞান বা অজ্ঞান চেষ্টা দেখা যায়। বাঙ্গালা উচ্চারণের একটী বিশিষ্ট নিয়ম এই যে, পরবর্তী অক্ষরে 'ই', 'উ' বা য-ফলা থাকিলে, পূর্ববর্তী অক্ষরের অ-কারের উচ্চারণ 'ও'

হইয়া যায়। ভাষাতত্ত্বের সূত্র ধরিয়া বিচার করিলে যেখানে ও-কার লেখা উচিত, তাহা না করিয়া এইরূপ শব্দ-সম্বন্ধে প্রাচীন রীতি বা ইতিহাসকে অবহেলা করিয়া, ও-কার না লিখিয়া, পরে 'ই' বা 'উ' থাকিলে, মাত্র অ-কার দ্বারাই বানানে এই ও-কারের ধ্বনি সূচিত করা হইতে থাকে। ফলে, 'নোতুন' স্থলে 'নতুন', 'গোরু' স্থলে 'গরু' (সংস্কৃত 'গো-রূপ'—প্রশংসার্থে বা স্বার্থে 'রূপ' শব্দ-যোগ, তাহা হইতে প্রাকৃতে 'গোরূব, গোরূঅ', তাহা হইতে আধুনিক ভাষায় হিন্দীতে 'গোরূ', বাঙ্গালায় 'গোরু'), 'মোতী' বা 'মোতি' স্থলে 'মতি' (মুক্তা অর্থে—সংস্কৃত 'মৌক্তিক', তাহা হইতে প্রাকৃতে 'মোত্তিঅ', তাহা হইতে ভাষায় 'মোতী'), ইত্যাদি বানানের উদ্ভব। শব্দের উৎপত্তি বিচার করিলে, ও-কার স্থলে অ-কার লেখা এইরূপ বানানকে অশুদ্ধই বলিতে হয়।

আরও দুইটী কথা,—প্রবন্ধ দুইটীতে প্রযুক্ত ভারতীয় ভাষার নামে বানান লইয়া 'বঙ্গভাষা' ও 'বঙ্গদেশ' অর্থে আমি সাধুভাষায় 'বাঙ্গালা' ও চলিত ভাষায় 'বাঙ্‌লা' লিখিয়াছি। আমি 'বাংলা' লিখি না : অনুস্বার দিয়া লিখিলে উচ্চারণের হানি হয় না, সত্য, কিন্তু চলিত ভাষায় জাতি-বাচক 'বাঙালী', 'বাঙাল' শব্দের মধ্যে নিহিত, সংযুক্তাক্ষর 'ঙ্গ'-এর সরলীকরণে জাত 'ঙ্'-র সহিত যোগ রাখিবার জন্য, দেশ- ও ভাষা-বাচক নামে 'ঙ' রাখিলেই ভাল হয় মনে করি। 'বঙ্গ'+'-আল' > 'বঙ্গাল' ; 'বঙ্গাল' > 'বাঙ্গাল, বাঙাল' ; 'বঙ্গাল' শব্দে ফারসী প্রত্যয় 'অহ্' বা 'আ' যোগে দেশের ফারসী নাম 'বঙ্গালহ্, বঙ্গালা' ; তাহা হইতে মধ্যযুগের বঙ্গভাষায় 'বাঙ্গালা', আধুনিক 'বাঙ্গ্‌লা, বাঙ্‌লা' ; 'ঙ্গ' অর্থাৎ 'ঙ্‌গ' হইতে 'গ'-এর লোপে মাত্র 'ঙ'-র অবস্থান, এবং আদ্য অক্ষরে স্বরাঘাত বলিষ্ঠ হওয়ায়, মধ্যস্থিত অক্ষরের স্বরাঘাত দুর্বল হইয়া পড়ে,—ফলে অক্ষর-নিহিত স্বরধ্বনি আ-কারের লোপ। 'ঙ্গ'-এর দুই প্রকার উচ্চারণ বঙ্গ-ভাষায় বিদ্যমান : [১] 'ঙ্‌গ', [২] 'ঙ' : 'বাঙ্গালা' > 'বাঙ্গলা, বাঙলা, বাঙ্‌লা'। 'বাঙ্গলা'—এইরূপ বানানও অনেকে লেখেন, এবং ইহার সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কিছু নাই ; তবে ইহা সাধু ভাষার অনুমোদিত পূর্ণাঙ্গ

প্রাচীন রূপ ('বাঙ্গালা') নহে, আবার চলিত ভাষার অনুমোদিত পশ্চিম-বঙ্গের মৌখিক উচ্চারণের অনুগামী রূপ ('বাঙ্‌লা')-ও নহে—দুইয়ের মধ্যে একটা যেন আপোষ-নিষ্পত্তি। 'বাঙ্গালা' কেবল সাধু ভাষায়, 'বাঙ্গলা' সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা উভয়েই, এবং 'বাঙ্‌লা' কেবল চলিত ভাষায়—এই তিনটী বানান-সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিতে পারে না। অনুস্বার দিয়া 'ঙ, ঙ' লেখা অবশ্য আজকাল বহু-প্রচলিত (যেমন 'ভোংচা, রং, ভাং, প্রভৃতি শব্দে); কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যে সংস্কৃত ব্যাকরণ-মতে একটা আপত্তি উঠিতে পারে, তাহা জানিয়া রাখা উচিত। সংস্কৃতে অনুস্বারের উচ্চারণ ছিল,—যে স্বরের পরে অনুস্বারের প্রয়োগ হইত, সেই স্বরের সানুনাসিক প্রলম্বী-করণে : 'অং'='অঁঅঁ' ; 'ইং'='ইঁইঁ' ; 'উং'='উঁউঁ' ইত্যাদি। এইরূপ উচ্চারণ প্রাকৃতেও ছিল। আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষাগুলিতে, ইহাদের তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দাবলীতে, অনুস্বার হয় লুপ্ত হইয়াছে, না হয় অনুনাসিকরূপেই পর্যবসিত হইয়াছে : যেমন 'করণকম্' > 'করণকং' > 'করণঅং' > 'করণয়ং' > মারহাট্টী 'করণেঁ'=করণ ; 'চলিতব্যকম্' > 'চলিতব্বকং' > 'চলিঅব্বঅং' > 'চলিঅব্বউং' > গুজরাটী 'চালবুঁ' ইত্যাদি। আজকালকার সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণে ও ভাষায় আগত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনুস্বারের প্রাচীন উচ্চারণ আর রক্ষিত নাই,—বিভিন্ন ও বিশিষ্ট বর্গীয় নাসিক্য ধ্বনিতে ইহার বিকার ঘটিয়া গিয়াছে ; যেমন দক্ষিণ ভারতে 'ং'='ম্' : 'হংসঃ, বংশঃ'='হম্‌স, বম্‌শ', 'সংস্কৃতম্'='সম্‌স্ক্রুতম্' ; উত্তর ভারতে 'ং'='ন্' : 'হংসঃ, বংশঃ, সংস্কৃতম্'='হন্‌স্, বন্‌স্, সন্‌স্ক্রিৎ' ; আর বঙ্গদেশে 'ং'='ঙ্' : 'হংসঃ বংশঃ, সংস্কৃতম্'='হঙ্‌শো, বঙ্‌শো, শঙ্‌শ্‌ক্রিতো' (বা 'শঙ্‌শ্রিতো')। সুতরাং 'বাঙ্গালা' ও তজ্জাত 'বাঙ্‌লা'কে 'বাংলা' রূপে লিখিলে, অনুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ (অর্থাৎ কিনা 'বাংলা'='বাঅঁলা') ধরিলে, এই বানানকে অশুদ্ধই বলিতে হয় ; অপিচ সমপর্যায়ের 'বাঙ্গালী, বাঙালী' শব্দের সহিত বানানের দৃষ্টি-গত সাদৃশ্যকে অনাবশ্যক-ভাবে লোপ করিয়া দেওয়া হয়।

আমি ভারতের অন্য কতকগুলি প্রাদেশিক ভাষার নাম 'গুজরাটী, মারহাট্টী, উড়িয়া' (চলিত ভাষায় 'উড়ে') রূপে লিখিয়াছি। এই সব বিষয়ে একটু অবহিত হইয়া যাঁহারা লিখিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের কেহ কেহ 'গুজরাতী, মারাঠী, ওড়িয়া' ইত্যাদি 'শুদ্ধ' রূপে লিখিয়া থাকেন ; এবং আমিও এইপ্রকার তথাকথিত 'শুদ্ধ' (অর্থাৎ যে ভাষার নাম, সেই ভাষার অনুমোদিত) রূপ পূর্বে লিখিয়াছি। এখন আমি 'গুজরাটী', 'মারহাট্টী' (বা 'মারাঠী'), 'উড়িয়া' (চলিত ভাষায় 'উড়ে') প্রভৃতি লেখার পক্ষে ; কারণ, এই রূপগুলি বাঙ্গালা ভাষার স্বকীয় প্রাচীন রূপ। মুখে সকলেই এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে ; আধুনিক বাঙ্গালায় হঠাৎ ইহাদিগকে বর্জন করিয়া, ইহাদের 'বিশুদ্ধ' রূপ লিখিয়া চক্ষু এবং কর্ণ উভয়েরই উপর উপদ্রব করিয়া, অনাবশ্যক-ভাবে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা হয় মাত্র। 'সংস্কৃত' পদ 'গূর্জর-ত্রা' হইতে 'গুজরাত' শব্দের উৎপত্তি—'গূর্জরত্রা' > 'গুজ্জরত্তা' > 'গুজ্জরত্ত' > 'গুজরাত' ; তাহা হইতে ভাষা ও জাতি অর্থে 'গুজরাতী' ; এবং গুজরাটের লোকেরা বরাবরই এই দন্ত্য-ত-যুক্ত পদই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, এবং এখনও করে—মূর্ধন্য-ট-কার-যুক্ত পদ তাহাদের মধ্যে অজ্ঞাত। তদ্রূপ 'মহারাষ্ট্রিক' > 'মহারট্‌ঠিঅ' > 'মহরাঠী' > 'মরাঠী' ; মহারাষ্ট্রনিবাসিগণ এই রূপই ব্যবহার করে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালাতে আমরা 'গুজরাট' রূপই পাই—এখানে 'রাষ্ট্র' শব্দের সহিত যোগ অনুমান করায়, মূর্ধন্য 'ট' আসিয়া গিয়াছে ; এবং মহারাষ্ট্রীর প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ 'মহারাট্টী, মারহাট্টী', বা কচিৎ 'মারাট্টি', এবং জাতি-অর্থে 'মারহাট্টা'। মুখে আমরা বলি 'গুজরাট,—গুজরাটী হাতী, গুজরাটী এলাচ', 'মারহাট্টা দেশ', 'মারহাট্টী ভাষা', বা 'মারাঠা জাত', 'মারাঠী ভাষা'। মুখে আমরা বলিয়া থাকি 'উড়িষ্যা', 'উড়িয়া', বা 'উড়ে' ; 'ওড়িশা', 'ওড়িয়া' আমাদের কাছে অজ্ঞাত। 'অসমিয়া' ছাপার হরফে দেখিলেও, সকলেই বলি 'আসামী'। এই সকল রূপ আমাদের বাঙ্গালা ভাষার—আমাদের ভাষার প্রকৃতি-অনুযায়ী প্রাচীন রূপ। গুজরাটীরা, মারহাট্টীরা বা উড়িয়ারা কি বলে বা লেখে, তাহা দেখিবার দরকার মনে করি না। তাহারাও আমাদের

বঙ্গ দেশের ও ভাষার নাম 'বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাঙলা', বা 'বাংলা'-কে আমাদের মত বানান করিয়া লেখে না; তাহারা লেখে 'বংগাল, বংগালী'; হিন্দীতেও তেমনি লেখে 'বংগাল-দেশ, বংগালী-জাতি, বংগলা-ভাষা'। মহারাষ্ট্রীয়েরা যখন গুজরাট দেশের সম্বন্ধে কিছু লেখে বা বলে, তখন তাহারা নিজ ভাষার শব্দ 'গুজরাথ, গুজরাথী'-ই ব্যবহার করে, কদাচ 'গুজরাত, গুজরাতী' লেখে না। 'হিন্দুস্থান, হিন্দুস্থানী' শব্দদ্বয়কে, তাহাদের বিশুদ্ধ হিন্দুস্তানী বা উর্দূ উচ্চারণ ধরিয়া, 'হিন্দোস্তাঁ, হিন্দোস্তানী' লিখিলে, বাঙ্গালা ভাষার ও বঙ্গভাষীর প্রতি নিতান্ত অত্যাচার করা হইবে। কোনও ইংরেজ, French, German, Danish, Norwegian, Welsh-এর বদলে, ঐ সকল ভাষায় ব্যবহৃত 'বিশুদ্ধ' রূপ Français, Deutsch, Dansk, Norsk, Cymraeg লেখা বা বলার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না; তদ্রূপ ফরাসীও নিজ ভাষার অনুরূপ, ইংরেজ অর্থে Anglais, ও জরমান, দিনেমার, নরউইজীয় ও ওয়েল্শ জাতি বুঝাইতে Allemand, Danois, Norvégien, Gallois ছাড়া আর কিছুর প্রয়োগ করিবে না। 'বিশুদ্ধ' রূপের নজীর দেখাইতে হইলে, প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার দিকেই প্রথম ও প্রধান দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রবন্ধ দুইটী প্রথম যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল প্রায় সেইরূপই রাখা হইয়াছে, অল্প দুই-চারি স্থানে ব্যতীত বিশেষ কিছু পরিবর্তন করা হয় নাই। অবস্থা-গতিকে প্রথম প্রবন্ধটী চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। চলিত ভাষা ও সাধু ভাষা উভয়ের ব্যবহার-সম্বন্ধে এই বইয়ের ১০ ও ১১ পৃষ্ঠায় এবং ৭১ ও ৭২ পৃষ্ঠায় কিছু বলা হইয়াছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, সাধু ভাষায় শিক্ষানবিশী করা, ইহার চর্চা করা, এবং বিশুদ্ধ-ভাবে অর্থাৎ চলিত ভাষার সহিত মিশ্রণ না ঘটাইয়া সাধু ভাষায় লেখা—বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহারা অধিকার লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের পক্ষে একটী বিশেষ প্রয়োজনীয়, এমন কি অপরিহার্য, ব্রত বা সাধনা। চলিত ভাষারও স্বকীয় ব্যাকরণ আছে, নিজস্ব শব্দ আছে, ধ্বনি-গত ও তদবলম্বনে বর্ণবিন্যাস-গত স্বাতন্ত্র্য আছে, নিজস্ব বাক্য-রীতি ও নানা রূঢ়ি-প্রয়োগ আছে। যাঁহারা জন্ম- ও শিক্ষা-গত

অধিকারে এইগুলি প্রাপ্ত হন নাই, এইগুলি আয়ত্ত করিয়া লইয়া তবে তাঁহাদিগের চলিত ভাষায় লিখিবার প্রয়াস করা উচিত। এই বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য, সাধু ভাষার সঙ্গে সঙ্গে চলিত ভাষারও ব্যাকরণ আবশ্যক; এখানেও নানা স্থূল ও সূক্ষ্ম নিয়মের যে যথেষ্ট বাঁধাবাঁধি আছে, অনেক সময়ে আমরা সে কথা ভুলিয়া যাই। মাতৃভাষার আলোচনা আমাদের পক্ষে শ্রদ্ধার বস্তু হওয়া উচিত। এই আলোচনাকে সার্থক করিতে হইলে আমাদের যে পরিমাণ যত্ন ও পরিশ্রম করা আবশ্যক—আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বাহন ও জাতীয় চিত্তের ও হৃদয়ের পরিচায়ক আমাদের সাহিত্য, তাহার সম্বন্ধে পূর্ণ প্রীতি ও গৌরব-বোধ এবং দায়িত্বজ্ঞান দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, এবং আমাদের ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখক—যাঁহাদের লেখা হইতে আমরা আনন্দ বা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি—আংশিক ভাবেও তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের ইচ্ছা লইয়া, সেই পরিমাণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে আমরা যেন কুণ্ঠিত না হই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
ভাদ্র ১৩৩৬ সাল,
সেপ্টেম্বর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

এই সংস্করণের শেষের তিনটী প্রবন্ধ নূতন করিয়া পুনর্মুদ্রিত হইল; 'স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি' প্রবন্ধটী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ১৩৩৬ সালের তৃতীয় সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। 'বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' ও 'বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' প্রবন্ধদ্বয় অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আকারে শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনের ও আমার সম্পাদিত ইস্কুলের

উপযোগী বাঙ্গালা পাঠমালা ('সাহিত্য-শিক্ষা') পুস্তকের জন্য মৎ-কর্তৃক প্রথম লিখিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ দুইটী এখন বহুস্থানে নূতন করিয়া লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম। 'সাহিত্য-শিক্ষা' পুস্তকের প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সেন-রায় কোম্পানী (১৫ সংখ্যক কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা) উক্ত প্রবন্ধ দুইটী ব্যবহারে তাঁহাদের সম্মতি দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে ছাত্র ও কৌতূহলী পাঠকবর্গের মনে আলোচ্য বিষয়-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার ভাব জাগরিত হইলে, সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

মাঘ ১৩৪০,
ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

'মহাপ্রাণ বর্ণ' শীর্ষক প্রবন্ধটী এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইল। এটী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা'-র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল; এই পুস্তকে ইহা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এবং ধ্বনিতত্ত্বানুমোদিত International Phonetic Association-এর বর্ণমালায় অক্ষরান্তরীকৃত উদাহরণাবলী সমেত পুনর্মুদ্রিত হইল। বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্বের একটী জটিল অথচ বহুপ্রচলিত বিষয়ের আলোচনার নিদর্শন-স্বরূপ এই প্রবন্ধটী ছাত্রছাত্রীগণের পাঠের জন্য এই সংস্করণে দেওয়া হইল।

অন্যান্য প্রবন্ধগুলিতেও অল্প-স্বল্প পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে।

এই সংস্করণে বানান-বিষয়ে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত একটী রীতি অবলম্বিত হইয়াছে—রেফের নীচে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব করা হয় নাই। যেখানে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত নহে,

যেখানে বর্ণটিকে পূর্বাবস্থিত র-কারের প্রভাবে দ্বিত্ব করিয়া লেখা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, ইহা বর্ণবিন্যাসে জটিলতা আনয়ন করে মাত্র। পূর্বে 'তর্ক্ক, স্বর্গ্গ, অর্ঘ্য, বর্ণ্ণ, সর্প্প, গর্দ্দ' প্রভৃতি লেখা হইত, এখন কেহ এরূপ লেখে না। তদ্রূপ, 'চ, ষ্ট, ঙ্গ, ণ্ড, ন্দ, ন্ধ, ন্ত' প্রভৃতিও বাঙ্গালা ভাষায় সর্বজনগৃহীত হইয়া যাইবে।

ইংরেজী st র জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত নূতন সংযুক্তবর্ণ 'স্ট'-ও এই পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আষাঢ় ১৩৪৩,
জুলাই ১৯৩৬।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

'বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' প্রবন্ধ কিছু কিছু পরিবর্ধন করা হইয়াছে, এবং অন্য প্রবন্ধগুলি আদ্যন্ত দেখিয়া দেওয়া হইয়াছে। মাঝে মাঝে ভাষাগত সামান্য পরিবর্তন ভিন্ন আর কোনও বিশেষ পরিবর্তন করা হয় নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণযন্ত্রের প্রধান প্রুফ-রীডার প্রিয়বর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বিশেষ যত্নসহকারে এই সংস্করণের প্রুফগুলি দেখিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আশ্বিন ১৩৪৯,
সেপ্টেম্বর ১৯৪২।

গ্রন্থকার

সাঙ্কেতিক চিহ্ন ইত্যাদি

ব—অন্তঃস্থ ব ইংরেজীর w-এর মত উচ্চারণ করিতে হইবে। আসামী ভাষার বর্ণমালায় এই অক্ষর আছে।

ণ—মূর্ধন্য ন, দেবনাগরীর ण।

ঝ়—ফরাসী j র ধ্বনি, ইংরেজী pleasure, measure শব্দের s-এর মত,—যেন কতকটা zh-এর ভাব।

* -কোনও শব্দের পূর্বে এই তারকা-চিহ্ন দেওয়ার অর্থ ঐ শব্দ বা তাহার মতন রূপ লিখিত সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই, কিন্তু রূপটী হইতেছে সম্ভাব্য বা পুনর্গঠিত রূপ; আধুনিক কথ্য ভাষায় বা সাহিত্যে ব্যবহৃত কোনও একটী রূপের বিকাশের ক্রম দেখাইতে গেলে, ভাষাতত্ত্ব-বিচার দ্বারা এই প্রকার পুনর্গঠিত বা সম্ভাব্য রূপ স্থির করিয়া লইতে হয়। পুস্তকের মধ্যে বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। এই তারকা-চিহ্নকে, 'সম্ভাব্য রূপ' অথবা 'পুনর্গঠিত-রূপ' বলিয়া পাঠ করিতে হইবে।

>—পরিণতির, বা বিকাশের, বা বিকারের গতি-দ্যোতক চিহ্ন: সংস্কৃত 'হস্ত' > প্রাকৃত 'হত্থ' > প্রাচীন বাঙ্গালা 'হাথ' > মধ্য যুগের বাঙ্গালা 'হাত' > আধুনিক বাঙ্গালা 'হাত'। > চিহ্নকে 'পরে' বলিয়া পড়িতে হইবে—সংস্কৃত 'হস্ত', পরে প্রাকৃত 'হত্থ', পরে প্রাচীন বাঙ্গালা 'হাথ' (হাথ্অ), পরে মধ্য যুগের বাঙ্গালা 'হাত' (হাত্অ), পরে আধুনিক বাঙ্গালা 'হাত্' (হাৎ)।

<—উৎপত্তির বা পূর্ববর্তী রূপের গতি-দ্যোতক চিহ্ন। এই চিহ্নকে, 'পূর্বে' বা 'তৎপূর্বে' অথবা 'তার পূর্বে' বলিয়া পাঠ করিতে হইবে। যথা—আধুনিক বাঙ্গালা 'হেঁট্' < মধ্যযুগের বাঙ্গালা 'হেঁট' < প্রাচীন বাঙ্গালা: '*হেণ্ট' < অপভ্রংশ মাগধী '*হেণ্ট' < '*হেণ্টো' < মাগধী প্রাকৃত

বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

বাঙলাভাষা আর বাঙালীজা'তের গোড়ার কথা

[হাওড়া শিবপুর সাহিত্য-সংসদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত
(২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩), ও পরে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত]

আপনাদের সাহিত্য সংসদের আজকের এই অধিবেশনে আমাকে সভাপতির আসনে আহ্বান ক'রে আপনারা আমাকে বিশেষ সম্মানিত ক'রেছেন, তার জন্যে আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনারা আমাকে একটু মুস্কিলেও ফেলেছেন। আমি সাহিত্যিক নই, দার্শনিক নই, কবি নই, বক্তা নই—ভাষাতত্ত্বের খুঁটিনাটি হ'চ্ছে আমার আলোচ্য বিষয়, আমার মাষ্টারী ব্যবসায়ের পুঁজিপাটা এই নিয়েই। আমার উপজীব্য এই বিষয়টী আমার নিজের কাছে প্রিয় হ'লেও, আমার আশঙ্কা হয় যে অন্যের কাছে এটা তত' আনন্দ-জনক হবে না। এ জ্ঞান আমার শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থেকেই হ'য়েছে। কিন্তু আপনাদের কাছে আমায় কিছু ব'লতে হবে, অনুরোধ এসেছে; এখন আমি আমার বাঙলা ভাষার ইতিহাস ছাপাতে ব্যস্ত র'য়েছি, আপনাদের সামনে আর কি নিয়ে উপস্থিত হবো ঠিক ক'রতে না পার্‌য়, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা আর আমাদের এই বাঙালী জা'তের উৎপত্তি-সম্বন্ধে যে দুটো কথা মনে হয়, তাই আজ আপনাদের সম্মুখে নিবেদন ক'রবো। মাতৃভাষার প্রতি আপনাদের সকলের আস্থা আর অনুরাগ আছে,—আর নিজের জা'তের সম্বন্ধে সব দেশের মানুষ, বিশেষতো শিক্ষিত মানুষ, আজকাল বেশী রকমে সাভিমান; অতএব খালি বিষয়ের গৌরবের জন্যও আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য নিবেদন ক'রতে সাহস ক'রছি।

পৃথিবীতে আজকাল যতগুলি ভাষা আর উপভাষা প্রচলিত আছে, তার সংখ্যা হবে আট শ' থেকে ন' শ'র মধ্যে। এর ভিতর নাকি ছ' শ' কুড়িটী বর্মা-সমেত ভারতবর্ষে বলা হয়; বর্মাকে বাদ দিলে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা নাকি দাঁড়ায় এক শ' ছেচল্লিশ। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে

লোক গণনার সময়ে ভারতে ব্যবহৃত ভাষাগুলির মোটামুটি একটা হিসাব নেওয়া হয়, তখন ভাষার তালিকা তৈরী ক'রে এই সংখ্যা দাঁড়ায়। ভারতবর্ষ নিয়ে' কোন কথা ব'লতে গেলে বর্মাকে বাদ দেওয়া উচিত; কারণ যদিও বর্মা এখন এই ১৩৩৩ সালে ভারত সরকারের অধীন, তবু জাতীয়তা, ইতিহাস, ভাষা, রীতি নীতি সব বিষয়েই বর্মা ভারতের অংশ নয়, সম্পূর্ণভাবে অন্য দেশ। বরং সিংহলকে ভারতের অংশ ব'লে ধরা উচিত, যদিও ভিন্ন সরকারদ্বারা সিংহল শাসিত। এখন, ভারতবর্ষের ভাষার সংখ্যা এই যে ১৪৯ ব'লে ধরা হয়েছে—একটু চুল-চেরা ভাগ করার ঝোঁক বশতো-ই সে ভাষার সংখ্যা এত বেশী দাঁড়িয়েছে। যত' সব ছোটো-খাটো ভাষা বা উপভাষাকে তাদের মূল ভাষা থেকে আলাদা ধ'রে দেখানোর ফলে, আর দক্ষিণ-হিমালয়, আসাম আর ব্রহ্ম-সীমান্তের (প্রকৃতপক্ষে ভারত-বহির্ভূত) নানা ভাষা এই তালিকার মধ্যে এসে' পড়ায়, সংখ্যাটা এত' ফেঁপে বেড়ে উঠেছে।

ভারতের ভাষাগুলি চারটী মুখ্য আর স্বতন্ত্র শ্রেণীর বা গোষ্ঠীতে পড়ে— [১] আর্য্য গোষ্ঠী, [২] দ্রাবিড় গোষ্ঠী, [৩] অস্ট্রিক বা কোল গোষ্ঠী, [৪] ভোট-চীন বা তিব্বতী-চীনা গোষ্ঠী। আসাম আর বর্মার সীমান্তে, তিব্বত আর হিমালয়ের প্রান্তদেশ জুড়ে' শেষোক্ত অর্থাৎ তিব্বতী-চীনা শ্রেণীর বহু ভাষা আর উপভাষা বিদ্যমান; সংখ্যায় এরা অনেকগুলি, কিন্তু একমাত্র তিব্বতী আর বর্মার বর্মী ছাড়া অন্যগুলির কোনও সাহিত্যিক স্থান বা প্রতিষ্ঠা নেই, আর অতি অল্প-সংখ্যক ক'রে অনুন্নত অবস্থার লোকেই এইসব ভাষা বলে। কোল গোষ্ঠীর ভাষা হ'চ্ছে সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো, কুরকু, শবর প্রভৃতি। কোল ভাষা এখন ছোটো-নাগপুরে আর মধ্য-ভারতে নিবদ্ধ, কিন্তু এক সময়ে এই শ্রেণীর ভাষা সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত ছিল। এই গোষ্ঠীর ভাষা-উপভাষা সংখ্যায় খুব বেশী নয়, আর বহু লোকে যে এ ভাষা বলে তাও নয়,—সব-শুদ্ধ চল্লিশ লাখ-এর কিছু উপর। কোল ভাষা হ'চ্ছে ভারতবর্ষের সব-চেয়ে প্রাচীন ভাষা—দ্রাবিড়, আর্য্য আর তিব্বতী-চীনা বা মোঙ্গোল জাতির লোক ভারতে আস্‌বার আগেও কোল ভাষার (অর্থাৎ-কিনা আধুনিক কোল ভাষার

অতি প্রাচীন রূপের প্রচার এ দেশে ছিল কিন্তু প্রতিবেশী আর্য্য-ভাষীদের প্রভাবে প'ড়ে কোল ভাষা ধীরে ধীরে তার প্রাণ-শক্তি হারাচ্ছে, অতি প্রাচীন কাল থেকেই কোল-ভাষী লোকেরা আর্য্য ভাষা গ্রহণ ক'রে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে আসছে। কোল ভাষার সম্পূর্ণ লোপ-সাধন আর তার জায়গায় বাঙলা, হিন্দী, বিহারী, উড়িয়া প্রভৃতি আর্য্য-ভাষার প্রতিষ্ঠা হ'তে বড় জোর ১০০ বা ১৫০ বছর লাগবে—অবশ্য কোল-ভাষীরা এখন যে অনুপাতে আর্য্য-ভাষা গ্রহণ ক'রছে সেটা যদি বজায় থাকে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা মুখ্যতো দক্ষিণ-ভারতে চলে, আর তা'-ছাড়া মধ্য-ভারতে কতকগুলি অনুন্নত জা'ত আর বেলুচীস্থানে ব্রাহুই-জা'তও দ্রাবিড় ভাষা বলে। দক্ষিণ ভারতে তমিল, মালয়ালী, কানাড়ী আর তেলুগু—এই চারটে হ'চ্ছে সব-চেয়ে প্রতিষ্ঠাপন্ন দ্রাবিড় ভাষা। বিশেষতো প্রাচীন তমিল, সাহিত্য-গৌরবে সংস্কৃতের পরেই আসন পেতে পারে। দ্রাবিড়-ভাষী লোকের সংখ্যা সাড়ে-ছয় কোটির কাছাকাছি—আর, সুসভ্য ও বিভেদের দ্বারায় আর্য্য ধর্ম আর সভ্যতা বাহ্যতো মেনে-নেওয়ার ফলে, দ্রাবিড় ভাষাগুলির উপর খুব বেশী ক'রে সংস্কৃতের প্রভাব বিস্তৃত হ'য়েছে (ব্রাহুই আর মধ্য-ভারতের অর্ধ-সভ্য দ্রাবিড় জা'তের ভাষাগুলি ছাড়া)

তারপরে বাকী থাকে আর্য্য গোষ্ঠীর ভাষাগুলি। সমগ্র উত্তর-ভারতে, আফগান-সীমান্ত থেকে আসাম-সীমান্ত পর্য্যন্ত, আর হিমালয় থেকে মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত এর ক্ষেত্র বিস্তৃত। আমাদের বাঙলা অবশ্য এই গোষ্ঠীর একটী বড় শাখা। পরস্পরের মধ্যে মিল ধ'রে আর্য্য গোষ্ঠীর ভাষাগুলিকে বিচার ক'রে দেখ্‌লে, এই ক'টী শ্রেণী বা শাখায় এদের ফেল্‌তে পারা যায়:—

[১] পূবে' বা পূবী শাখা। এর ভিতর বিহারের মৈথিল মগহী আর ভোজপুরে', যথাক্রমে এক কোটি দু লাখ, সত্তর লাখ পঁয়ষট্টি হাজার, আর দু কোটি চার লাখ লোকে বলে; আর বাঙলা, আসামী, উড়ে', যথাক্রমে পাঁচ কোটি, সতেরো লাখ, আর এক কোটি এগারো লাখ লোকেরই মধ্যে প্রচলিত। *

* লোক-সংখ্যা ১৯০০র আগে নির্দ্ধারিত Linguistic Survey of India অনুসারে।

[২] মধ্য-পূর্বী শাখা, বা পূর্বী হিন্দী বা কোসলী—এর তিন প্রকার রূপ-ভেদ আছে,—অযোধ্যা-প্রদেশের ভাষা আউধী বা বৈসওয়াড়ী, বাঘেলখণ্ডের ভাষা বাঘেলী, আর মধ্য-প্রদেশের পূর্ব অঞ্চলের ভাষা ছত্রিশগড়ী; সব শুদ্ধ আড়াই কোটি লোকে এই পূর্বী-হিন্দী বা কোসলী ব্যবহার করে।

[৩] মধ্যদেশীয় শাখা, বা পশ্চিমা-হিন্দী—চার কোটি বারো লাখ লোকের মধ্যে প্রচলিত। এই পশ্চিমা-হিন্দী শাখার মধ্যে পড়ে—মথুরা-অঞ্চলের ব্রজভাখা; কনোজ অঞ্চলের কনৌজী, বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলী, অম্বালা অঞ্চলের আর দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাব-অঞ্চলের মৌখিক ভাষা; আর দিল্লী মীরাট অঞ্চলের হিন্দুস্থানী। এই শেষোক্ত হিন্দুস্থানীর সাহিত্যিক রূপ দু'টী,—এক, উর্দূ, আর দুই, হিন্দী, এই হিন্দুস্থানী বা হিন্দী বা উর্দূ ভারতবর্ষময় এখন ছড়িয়ে প'ড়েছে, আর ইংরেজীর পরেই ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে

[৪] দক্ষিণ-পশ্চিমা শাখা, বা রাজস্থানী-গুজরাটী—এর মধ্যে পড়ে মারবাড়ী, মালবী, জয়পুরী, হাড়োতী প্রভৃতি রাজপুতানার নানা বিভাষা, যা দেড় কোটি আন্দাজ লোকে বলে, আর পড়ে গুজরাটী ভাষা, যা আনুমানিক এক কোটির কিছু উপর সংখ্যার লোক বলে

[৪ক] এই শাখার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ভীলী-খান্দেশী উপভাষা-সমূহ; এগুলি রাজপুতানার আড়বলা বা আরাবলী পাহাড়ের কোল-জাতির থেকে উদ্ভূত ভীলদের মধ্যে প্রচলিত, গুজরাট আর রাজপুতানার সীমানাতেও ভীলী ভাষা প্রচলিত, এবং খান্দেশ-অঞ্চলে মারাঠীর সঙ্গে অল্পস্বল্প মিশ্রিত-রূপে এই উপভাষা বিদ্যমান। ভীলী ও খান্দেশী সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় না,—যারা এই দুই উপভাষা ঘরে বলে, তারা গুজরাটী আর হিন্দীই সাহিত্যিক ভাষারূপে শিক্ষা করে। আটত্রিশ লক্ষের কিছু অধিক লোকের মধ্যে এই উপভাষাগুলি প্রচলিত।

[৫] উত্তর-পশ্চিমা শাখা—এর মধ্যে আসে পূর্বী পাঞ্জাবী (এক কোটি আটান্ন লাখ), হিন্দকী বা লহন্দী বা পশ্চিমা-পাঞ্জাবী (সত্তর লাখ), আর সিন্ধী (ছত্রিশ লাখ)।

[৬] দক্ষিণী, বা মারহাট্টি শাখা—দুই কোটির উপর।

[৭] উত্তুরে', বা পাহাড়ী, অথবা হিমালয়ের শাখা কাশ্মীর আর পাঞ্জাবের পূর্ব থেকে ভোটান পর্যন্ত হিমালয়ের দক্ষিণ-অঞ্চল আশ্রয় ক'রে এই শাখার নানা ভাষা প্রচলিত আছে। এগুলিকে তিনটী প্রশাখায় বিভক্ত করা হ'য়েছে—(১) পূর্বী পাহাড়ী, গুরখালী বা নেপালী বা পর্বতিয়া অথবা খসকুরা,—গুরখাদের ভাষা; (২) মধ্য পাহাড়ী—কুমাউনী, আর গাড়োয়ালী; (৩) পশ্চিমা-পাহাড়ী উপভাষা-সমূহ। সব-শুদ্ধ প্রায় বিশ লাখ; কেবল নেপালী ভাষার ঠিক সংখ্যা জানা যায় না।

[৮] সিংহলদ্বীপের আর্য্য ভাষা সিংহলী, ও মালদ্বীপের ভাষা—ত্রিশ লাখ।

এ ছাড়া, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে কতকগুলি লোক পশ্চিম এশিয়া আর ইউরোপে ছড়িয়ে' পড়ে। সেই সব দেশে তারা যাযাবর বৃত্তি বা ভবঘুরে' বেদের জীবন অবলম্বন করে। ইংরিজীতে এদের (Gipsy) জিপ্সি বলে; ইউরোপে বহু স্থলে এই জিপ্সিরা এখনও আমাদের ভারতীয় আর্য্য ভাষাই বলে।

কাশ্মীরে কাশ্মীরী, আর ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে কাশ্মীরীর সঙ্গে সম্পৃক্ত আরও কতকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে,—যেমন শীণা, চিত্রালী প্রভৃতি; এগুলিও আর্য্য ভাষা, কিন্তু ভারতবর্ষের আর্য্য-ভাষাগুলি থেকে একটু তফাৎ; আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষার মূল বৈদিক ভাষা, আর কাশ্মীরী প্রভৃতির আকর ছিল যে ভাষা, এ দু'টী পরস্পর স্বসৃ-সম্পর্কে সম্পর্কিত।

(২)

খ্রীষ্টীয় ১৯৩১ সালের লোক-গণনার হিসেবে, বাঙলা ভাষা পাঁচ কোটি চৌত্রিশ লাখের উপর লোকের মাতৃভাষা। এ কথা অনেক বাঙালীর কাছে—আর অ-বাঙালীর কাছেও—নোতুন ঠেকবে যে, সমগ্র ভারতের তাবৎ ভাষার মধ্যে বাঙলাই হ'চ্ছে সব চেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা! মাতৃভাষা-হিসেবে ভারতে আর কোনও ভাষা এত' বিস্তৃত নয়। আমাদের দেশে অবশ্য হিন্দুস্থানী

culture বা উৎকর্ষের অপর কোনো দিক্-সম্বন্ধে এতটা গৌরব অনুভব করে না। মহাত্মা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বাঙলার যাঁরা যথার্থ লোকনেতা হ'য়েছেন, তাঁরা সকলেই তার সাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে সাহায্য ক'রেছেন। বাঙলার তথা আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কবি বাঙলাদেশ আর বাঙালী জা'ত-সম্বন্ধে যে প্রার্থনা-গান গেয়েছেন, তাতে তিনি এও চেয়েছেন—

বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা,
বাঙালীর প্রাণে যত' ভালোবাসা,—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান্।

আর এই আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত বাঙালীর, সমস্ত বাঙলা-ভাষীর-ই আকাঙ্ক্ষা।

আপনাদের কাছে আমাদের এই বাঙলা ভাষার, আর এই ভাষা যারা বলে সেই বাঙালী জা'তের উৎপত্তি আর অভ্যুত্থানের নিদর্শন ক'রবো। যা নিয়ে' আমরা গর্ব করি, সেই জিনিসটী আমরা যেন' সত্য পরিচয়ের দ্বারা আপনার ক'রে নিতে পারি, আমাদের ভালোবাসা আর গর্ব যেন' জ্ঞানের অবলম্বনে সুদৃঢ় হয়। আত্মবোধ বা যে কোনও বোধ জ্ঞান-প্রসূত না হ'লে অন্ধ বিশ্বাস হ'য়ে দাঁড়ায়, আর অন্ধ-বিশ্বাস অনেক সময়ে আত্মঘাতী হয়।

বাঙলা ভাষা এখন সমস্ত বাঙলাদেশ জুড়ে' বিদ্যমান র'য়েছে, এর অস্তিত্ব একটা অতি বাস্তব সত্য। আমরা এই ভাষায় কথাবার্ত্তা কইছি, লিখ্ছি, এর জীবন্ত মূর্ত্তি আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমাদের এই বাঙলা ভাষার রূপ কিন্তু 'একমেবাদ্বিতীয়ম' নয়। যাকে আশ্রয় করে, ভাষা সেই মানুষের ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে প্রকাশ পায়; কাজেই যত' মানুষ, তত' বিচিত্ররূপে এক-ই ভাষার প্রকাশ। সব ভাষা-ই একটী বহুরূপী বস্তু —সম্প্রদায়-ভেদে, জাতি-ভেদে, ব্যবসায়-ভেদে, স্থান-ভেদে, ব্যক্তি-ভেদে যেমন এর রূপ বদ্‌লায়, আবার কাল-ভেদেও তেমনি বদ্‌লায়। আবার অবস্থা-গতিকে আধুনিক রূপেও প্রাচীনের ছাপ বহুস্থলে দেখা যায়। বাঙলার এক সাধু-

ভাষার রূপ আছে, সেটা এর পুরাতন সাহিত্যিক রূপ। তারপর আছে চল্‌তি ভাষা,—যেটা হ'চ্ছে শিক্ষিত সমাজে ব্যবহৃত কথাবার্তার ভাষা, ভাগীরথী-তীরের ভদ্র সমাজের ভাষার উপর যার ভিত্তি, যে ভাষা অবলম্বন ক'রে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য আমি নিবেদন ক'রছি, যে ভাষা এখন বাঙলাদেশের সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষিত লোকের মধ্যে গৃহীত হ'য়ে গিয়েছে, যে ভাষা আজকালকার বাঙলা সাহিত্যে সাধু-ভাষার এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; আর যে ধারা এখন সাহিত্যে চ'লছে সে ধারা বাধা না পেয়ে চ'লতে থাক্‌লে, যে ভাষা কালে সমগ্র বাঙালী জাতির একমাত্র সাহিত্যের ভাষা হ'য়ে দাঁড়াবে—এখনকার সাধু-ভাষাকে একেবারে হটিয়ে' দিয়ে'। বাঙলার এই দুই সর্বজন পরিচিত মূর্তি ছাড়া, আধুনিক কালে বাঙলার নানা অঞ্চলে প্রচলিত নানা প্রাদেশিক মূর্তিও দেখা যায়। আবার প্রাচীন সাহিত্যেও বাঙলার অন্য মূর্তি পাওয়া যায়, সেই মূর্তি আমাদের চোখে এখন বড়ো বিচিত্র লাগে। এখন, এই সব মূর্তিকেই সমান ভাবে 'বাঙলা' আখ্যা দিতে হয়। এরা একই বাঙলার রূপ-ভেদ। যাকে 'বাঙলা-ত্ব' গুণ বলা যেতে পারে, তা এদের সকলের-ই আছে, অথচ এর স্বতন্ত্র। এক বাঙলা তরুর এরা নানা শাখা-পল্লব। এই সকল শাখা-ই স্ব-স্ব-প্রধান, কেউ কারো চেয়ে কম নয়। ভাষাতত্ত্বের দিক্ থেকে বিচার ক'রলে, বাঙলার নানা অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষাগুলি সবাই তুল্য মূল্য। তবে একটী বিশেষ শাখা, অনুকূল অবস্থায় প'ড়ে যখন শিক্ষিত সমাজের আদরের বস্তু হ'য়ে দাঁড়ায়,—কবি আর চিন্তাশীল লেখকের আশ্রয় স্থান হ'য়ে, ভাব আর চিন্তার সার পেয়ে, উচ্চ সাহিত্যের অবলম্বন পেয়ে যখন এই শাখা খুব বেড়ে যায়—তখন স্বভাবতঃ অন্য শাখাগুলি এর আওতায় প'ড়ে যায়, আর এর সমৃদ্ধির দিকেই সকলের দৃষ্টি পড়ে। অন্য শাখাগুলির প্রতি দরদী ভাষাতাত্ত্বিক বা প্রাদেশিক-সাহিত্য রসিক ভিন্ন আর কেউ দৃষ্টিপাত করে না। এক দিকে যে ভাষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আশ্রয় স্থল, আর অন্য দিকে জীবনে রসের দিক্ থেকে সব-চেয়ে সুমিষ্ট ফল যার কাছ থেকে আমরা পাই, সেই ভাষা-তরুর উৎপত্তি

কি ক'রে হ'ল, তার মূল কোথায়, কতদিনে কি ভাবে এই তরু এত' বড়ো হ'য়ে উঠেছে, এ সম্বন্ধে আমাদের স্বভাবতো কৌতূহল হওয়া উচিত—অন্ততো শিক্ষার স্পর্শে আমাদের মনে এই কৌতূহলের উদ্রেক হওয়া উচিত

ভাষার static অর্থাৎ কোনও এক নির্দিষ্ট কালে তার স্তব্ধ বা নিশ্চল অবস্থা মনে ক'রে গাছের সঙ্গে আমি তার এই উপমা দিলুম। আবার তার dynamic অর্থাৎ গতিশীল অবস্থা মনে ক'রে, বহতা নদীর সঙ্গেই সাধারণতো তার উপমা দেওয়া হ'য়ে থাকে। এই নদীর উপমাটী বড় চমৎকার। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে, কোনও জা'তকে অবলম্বন ক'রে একটী ভাষার গতি এক দিকে, আর দেশ থেকে দেশান্তর ধ'রে নদীর গতি এক দিকে—এ দুইয়ের মধ্যে বেশ একটা মিল দেখতে পা'ওয়া যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এক বংশ পীঠিকা থেকে আর এক বংশ পীঠিকায় পারম্পর্য্য-ক্রমে বাহিত হ'য়ে আমাদের ভাষা-স্রোত চ'লে আ'সছে। আমাদের ভাষা এখন মস্ত এক নদী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—প্রায় ৫½ ক্রোড় নরনারীর মস্তিষ্ক আর জিহ্বা জুড়ে' এর বিস্তার; এর নিজস্ব আর তা' ছাড়া বাইরের ভাষা থেকে লব্ধ বিরাট্ শব্দ-সম্ভারে এর কূল ছাপিয়ে' উঠেছে; বিশাল ভাবের আর জ্ঞানের ক্ষেত্র এর দ্বারা ফলবান্ হ'চ্ছে, দূর দেশান্তর থেকে নানা ভাবের আর চিন্তার ঐশ্বর্য্য এর স্রোত বেয়ে' এদেশে আস্‌ছে। কত শতাব্দী ধ'রে, কেমন সরল ভাবে বা এঁকেবেঁকে এই নদীর গতি চ'লে এসেছে, কোন্ কোন্ উপনদী এতে এসে প'ড়ে তার কর-সম্ভার দিয়ে' একে পুষ্ট ক'রেছে, কোন্ কোন্ নোতুন খাত এ নিজে খুঁড়ে নিয়েছে, কোন্ মরা গাঙের খাত দিয়ে' বা এর জলে বান উজিয়েছে, কোনখানে বা এর জল শুখিয়ে' চড়া প'ড়ে গিয়েছে—অর্থাৎ কিনা, কি রকম ক'রে প্রাচীনতম যুগ থেকে কোন্ ভাষা কি পদ্ধতিতে ব'দলে-ব'দলে কবে বাঙলা ভাষার রূপ ধ'রে ব'সেছে; কোন্ কোন্ ভাষা থেকে নোতুন শব্দ এসে এই ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি ক'রেছে; কোন্ সময়ে আর কি অবস্থায় কি কি বিষয়ে বাঙলা ভাষা তার প্রাচীন রূপ ত্যাগ ক'রে নোতুন রূপ ধারণ ক'রেছে—তা ধ্বনিতেই হোক্, বা প্রত্যয়েতেই হোক্,

বা বাক্য-রীতিতেই হোক্ ; বা কোথায়, কি ক'রে, কবে, কোন্ অন্য অর্থাৎ অনার্য্য ভাষাকে তাড়িয়ে' দিয়ে বাঙলা তার স্থান অধিকার ক'রেছে, আর সেই লুপ্ত ভাষা ম'রে গিয়েও তার ছাপ কেমন ক'রে বাঙলা ভাষার উপরে দিয়ে' গিয়েছে ;—কোথায় বা বাঙলা ভাষা মেনে নেওয়ার ফলে জা'তের মধ্যে অন্তর্নিহিত মানসিক আর আত্মিক শক্তি স্ফূর্তি পেয়েছে ; কি রকম ক'রে আবার বাঙলা ভাষা তার নিজস্ব শব্দ আর শক্তি হারিয়ে' ফেলেছে, কোথায় বা সাহিত্যে তার বিকাশ হ'তে পারে নি ,—এই সবের ফলে কি ক'রে বাঙলা ভাষা তার আধুনিক রূপ পেয়েছে ;—এর আলোচনা একটু পুঙ্খানুপুঙ্খ আর অনেকটা এই বিদ্যার শাস্ত্র-অনুসারী বিচার সাপেক্ষ হ'লেও, আমার মনে হয়, মানসিক-সংস্কৃতি-কামী ই'তিহাস প্রিয় শিক্ষিত সজ্জনের পক্ষে এটা একটা বিশেষ সার্থক আলোচনা ,—কেবল ঐতিহাসিকতার জন্যে নয়, কিন্তু সব বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি আর বিচা'র-শক্তিকে জাগিয়ে' তোলবার যোগাড় ক'রে ব'লে, এই আলোচনার বিশেষ একটু মূল্য আছে ।

(৩)

বাঙলা আর বাঙলার মতন ভারতবর্ষের অপরাপর আর্য্য ভাষার ইতিহাস আলোচনা ক'রতে গিয়ে' কালের দিকে দৃষ্টি রাখ্‌লে দু'দিকে দু'টো অবধি পাই এক দিকে হ'চ্ছে আমাদের আধুনিক কাল, খ্রীষ্টীয় বিংশ শতক, আর এখনকার চলতি বাঙলা ভাষা, যে জীবন্ত ভাষ আমরা কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করি ; অপর দিকে হ'চ্ছে ঋগ্‌বেদের কাল আর সেই সময়ের ভাষা, যার নমুনা ঋগ্‌বেদ-সংহিতায় পাচ্ছি ভবিষ্যতে বাঙলা কি মূর্তি ধারণ ক'রবে, সে বিষয়ে কল্পনা-জল্পনা করবার কোনো সার্থকতা নেই ঋগ্‌বেদের পূর্বে আর্য্য-ভাষার কি রূপ ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা সব বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারিনি ; কিন্তু "তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্ব" নামে যে আধুনিক বিদ্যা আছে, তার অনুমোদিত অনুশীলন-রীতি ধ'রে এ বিষয়ে আলোচনা ক'রে, তার অনেকখানি আমরা অনুমান ক'রতে পারি । কিন্তু ঋগ্‌বেদের পূর্বের কোনো বই বা লেখা আমরা

পাই না, এখানে হ'চ্ছে বস্তুর অভাব। সেই জন্যে কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না; আমাদের অনুমান যে সত্য, সে সম্বন্ধে খুব সন্দেহের কারণ না থাকলেও, সেটা প্রমাণিত সত্য হয় না। ঋগ্বেদের পূর্বের যুগের আদি আর্য ভাষার অবস্থা-সম্বন্ধে আলোচনা করা, আর সেই ভাষা ও তার দৌহিত্র-স্থানীয় বৈদিক আর প্রাচীন ঈরানীয়, আর গ্রীক, লাতীন, কেল্টিক, জর্মানিক, স্লাব প্রভৃতির পরস্পরের তুলনা-দ্বারা যোজনা ক'রে গ'ড়ে তোলবার প্রয়াস, বেশ একটা কৌতুক-প্রদ বিষয়। কিন্তু বাংলার সঙ্গে তার যোগ তিন পুরুষ অন্তরিত। এ যেন কোনও মনুষ্যের জীবনচরিত লিখতে গিয়ে তার বৃদ্ধ-প্রপিতামহ থেকে আরম্ভ ক'রে তার পুরুষের জীবন চরিত আলোচনা করা। আমাদের এখন অত দূরের কথা ভাববার দরকার নেই। ঋগ্বেদের ভাষা ভারতের আর্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। ঋগ্বেদের ভাষায় এমন কতক কিছু পাওয়া যায়, যার থেকে এর প্রাচীনত্ব সহজেই অনুমান করা যায়, আর যেখানে ভারতীয় আধুনিক আর্য ভাষাগুলির জড় বা মূল গিয়ে পৌঁছেছে, এ যে সেইখানকার পরিচয় দেয়, তা বুঝতে দেরী হয় না। সকলেই জানেন যে, ঋগ্বেদ দেবতাদের আরাধনা বিষয়ক কবিতা বা স্তোত্রের একটী সংগ্রহ — এতে ১,০২৮টী 'সূক্ত' বা স্তোত্র আছে। এই সব স্তোত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি বা কবি রচনা ক'রেছেন। এগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, পরে সংগ্রহ ক'রে একখানি বইয়ে সঙ্কলন করা হয়। এই সঙ্কলনটী কবে যে করা হ'য়েছিল, তা নিশ্চিত-রূপে জানা যায় না, তবে কেউ কেউ মনে করেন, সেটা আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বের দিকে হ'য়েছিল, কারও বা মতে আরও ১৫০ বছর পরে, আবার অন্য অনেকে বিশ্বাস করেন যে খ্রীষ্ট-পূর্ব ১৫০০ বা ২০০০, বা ২৫০০ বা ৩০০০, বা ৪০০০ বছর পূর্বে, এমন কি তারও আগে, এই সঙ্কলন হ'য়েছিল। আমি প্রথম মতটাকেই, অর্থাৎ ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বকেই, সমীচীন ব'লে মনে করি — তার পরে হ'তেও পারে তা স্বীকার করি, কিন্তু তার পূর্বে আর যেতে চাই না। অন্য সব মতের কথা এই ক্ষেত্রে এখন আলোচনা ক'রবো না। আনুমানিক ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বে সঙ্কলিত হ'লে, ঋগ্বেদের অনেকগুলি 'সূক্ত' বা স্তোত্রের রচনা-কাল তার

৩৫০০ খৃ’ কি আরও বেশী বছর আগে ব’লে অক্লেশে ধরা যেতে পারে ঋগ্বেদের পর, অর্থাৎ মোটামুটি ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব থেকে, আধুনিক বাংলা, হিন্দী, মারহাট্টী পর্যন্ত, ধারাবাহিক-রূপে আদি আর্য্য-ভাষার নদী ব’য়ে এসেছে। ১৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব থেকে আজকালকার দিন পর্যন্ত ধরা যাক্ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত —এই প্রায় ৩,৪০০ বছর ধ’রে আর্য্য ভাষার গতির নিদর্শন আমরা মোটামুটি একরকম বেশ পরিষ্কার-ভাবে দেখতে পাই ভারতবর্ষের সাহিত্যে—বেদ সংহিতায়, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে, উপনিষদে, বৌদ্ধ পালি আর গাথা-সাহিত্যে, মহারাজ অশোকের সময় থেকে আরম্ভ ক’রে প্রাচীন শিলালেখে, জৈনদের প্রাকৃত সাহিত্যে, সংস্কৃত ইতিহাসে পুরাণে নাটকে কাব্যে, প্রাকৃত আর অপভ্রংশ সাহিত্যে, আধুনিক আর্য্য-ভাষাগুলির সাহিত্যে, আর আজকালকার কথিত ভাষাগুলির মধ্যে। এ যেন’ একটা লম্বা ভাষার শিকল বৈদিক কাল থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত চ’লে এসেছে,—পর পর এক এক যুগের বা কালের সাহিত্যে তখনকার ভাষার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলি হ’চ্ছে এই শিকলটার এক একটা কড়া বা আংটা। কিন্তু কালের মহিমায় আর ভাগ্য-বিপর্যয়ে, এই শিকলের প্রত্যেক কড়াটা বা আংটাটা এখন আর যথাযথ একটার পর একটা ক’রে পাওয়া যায় না, কারণ পর পর প্রত্যেক বংশ-পীঠিকা বা শতক-পাদ বা শতকের ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হ’য়ে আ’সেনি। যেখানে-যেখানে এই কড়ার অভাবে ফাঁক র’য়ে গিয়েছে, সেখানে-সেখানে কি অবস্থার মধ্য দিয়ে’ ভাষার গতি হ’য়েছিল, সেটা অনুমান ক’রে নিতে হয়। ভাষা-স্রোতস্বিনী ব’য়ে এসেছে ঠিক, কিন্তু অনেক জায়গায় সাহিত্যের অভাবে তার ধারার রেখাটী অস্পষ্ট, আর এই অভাব তাকে বহু স্থানে আমাদের চোখের আড়ালে অন্তঃসলিলা ক’রে অজ্ঞাতের বালির তলা দিয়ে’ বইয়ে’ এনেছে।

এখন আমরা মন দিয়ে’ বিচার বিশ্লেষণ ক’রে আমাদের ভাষার বর্ণনা লিখে’ রেখে’ যাচ্ছি, আমাদের বিরাট্ আর প্রবর্ধমান সাহিত্যে চিরকালের জন্য আমাদের ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হ’য়ে থাক্‌ছে; আর তা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রসাদে, গ্রামোফোনের রেকর্ডে, গানে আবৃত্তিতে কথোপকথনে

বক্তৃতায় আমাদের ভাষার ছাপ ধরা থাকছে—ভবিষ্যদ্বংশীয়দের ভাষা চর্চায় এগুলি বিশেষ সহায়তা ক'রবে, এগুলি একেবারে অপরিহার্য হবে। সুতরাং আমাদের এই কালের ভাষার আলোচনার কাজে আজ থেকে দু'-তিন শ' বছর পরে যে-সব ভাষাতাত্ত্বিক পরিশ্রম ক'রবেন, তাঁদের জন্যে অনেক উপযোগী মাল-মশলা বেশ ভালো ক'রেই প্রস্তুত হ'য়ে থাকছে। বাঙলা সন ১৫৪২ বা ১৭৪২ সালে ভাষাতত্ত্ব বা উচ্চারণতত্ত্ব-রসিকেরা, এমন কি কাব্যরস-রসিকেরাও, অক্লেশে রবীন্দ্রনাথের গান তাঁরই গলায় রেকর্ডে শুনতে পাবেন; ভবিষ্যদ্বংশীয়দের প্রতি দৃষ্টি রেখে ইউরোপের কোথাও কোথাও ভাষাতত্ত্ব-সংগ্রহাগারে এই রকম সব রেকর্ড রক্ষিত হ'চ্ছে। আমরা যদি চণ্ডীদাসের মুখের গানের রেকর্ড পেতুম,—যদি শুকদেবের সময়ে গ্রামোফোনের রেওয়াজ থাকত, আর যদি তাঁর দু'-একটা উপদেশ তাঁরই ভাষায়, তাঁরই কণ্ঠে শুনতে পেতুম। বৈদিক ঋষিদের বেদ-গান তেমনি ক'রে যদি শোনবার উপায় থাকত। এ কথাগুলি পরকালদর্শী ঢঙে অদ্ভুত কিছুর রহস্যের ভাবে ব'লছি না—আমি খালি উদাহরণ-স্বরূপে এই কথাটা দেখাবার জন্যেই ব'লছিলুম যে অল্প-স্বল্প সাহিত্যের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যে যুগের ভাষা আলোচনা করি, আমাদের সেই আলোচনা সেই যুগের ভাষার স্বরূপটা কতটুকু-ই বা দেখাতে সমর্থ হয়। ভারতীয় আর্য-ভাষার ইতিহাসে আবার দেখি যে, বহু স্থলে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে এই সাহিত্যের সাক্ষ্য-টুকুও অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য। বাঙলা ভাষার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা ক'রতে গেলে, বস্তুর অভাব-জনিত এই অসুবিধা-টুকু আমাদের পদে পদে বাধা দেয়।

বাঙলা ভাষার অবস্থা এখন বেশ বাড়-বাড়ন্ত। এক শ' বছর আগে এই ভাষার কি অবস্থা ছিল, তা আমরা তখনকার সাহিত্য থেকে কতকটা বুঝতে পারি। তখন দু'-একখানা ব্যাকরণও লেখা হ'য়েছে, তা থেকে আমরা কিছু-কিছু খবর পাই, আর বুঝতে পারি যে, সাধু-ভাষা, চলতি-ভাষা প্রভৃতি নানারূপে বহুরূপী হ'য়ে তখন বাঙলা ভাষা প্রকটিত ছিল। তার পূর্বের যুগের বাঙলার নিদর্শন কেবল তখনকার রচিত সাহিত্যে-ই পাই; বাঙলা ব্যাকরণ তখন

লেখা হয়নি, তাই তার সাহায্য আর মেলে না। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙলা ভাষা প্রথম ছাপার অক্ষরে ওঠে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় আঠারো শ' সাল পেরিয়ে' তবে ছাপাখানার দ্বারা বাঙলা ভাষা আর বাঙলা সাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। আঠারো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাঙলা সাহিত্য হাতের লেখা পুঁথিতেই নিবদ্ধ ছিল। খ্রীষ্টীয় ষোলো থেকে আঠারোর শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তর বাঙলা পুঁথি পাওয়া যায়; তা থেকে এই দু' শ বছরের বাঙলা ভাষা-সম্বন্ধে একটা ধারণা ক'রতে পারা যায়। আর এই দু শ বছরের আগেকার সময়ের, অর্থাৎ-কিনা ষোলো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকারও ভাষার সম্বন্ধে, এইসব পুঁথি থেকেই কতকটা অনুমান ক'রতে পারি, কারণ ষোলো শ'র আগে রচা অনেক বই ষোলো শ'র পরে নকল করা হ'য়েছে; এই সব নকলে একটু আধটু (কোথাও বা অনেকখানি) মূল থেকে ব'দলে গেলেও, পুরানো ভাষা অনেকটাই পাওয়া যায়। কিন্তু বই লেখার ২।৩ শ' বছর পরে নকল-করা তার যে পুঁথি পাওয়া যায়, সে পুঁথি থেকে, মূল রচনার কালের ভাষার যথার্থ অবস্থা সব সময়ে বোঝা যায় না, কারণ যারা নকল ক'রত তারা তো আর ভাষাতাত্ত্বিক ছিল না, যে অবিকল নকল করবার চেষ্টা ক'রবে; আর সে ইচ্ছা থাকলেও তারা মানুষ ছিল, কল ছিল না—তাদের নকলে সময়ে-সময়ে ভুল-চুক হ'ত, আর শব্দ আর প্রত্যয়ের পুরানো রূপ ঠিক থাকত না, ব'দলে যেত', ফলে অবশ্য, ভাষা নকলের যুগের লোকের পক্ষে সুপাঠ্য হ'য়ে যেত'। কাজেই সে সময়ের বই, সেই সময়ের পুঁথি হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। জলের দেশ বাঙলা—কাগজ সহজেই প'চে যায়, তাল পাতার কালির দাগ ধুয়ে' মুছে' যায়; তা' ছাড়া উইয়ের উৎপাত আছে, ঘর-পোড়া আছে, বন্যা আছে, অজ্ঞ বা অক্ষম লোকের যত্নের অভাব আছে। খুব পুরাতন পুঁথি এই কারণে মেলা দুর্ঘট। ষোলো শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের বাঙলা পুঁথি খুবই কম পাওয়া যায়। যে দু'-চার খানি পাওয়া যায়, ভাষার আলোচনার পক্ষে সেগুলির মূল্য খুবই বেশী। পনেরো শ' খ্রীষ্টাব্দের আগে লেখা বাঙলা পুঁথি অপ্রাপ্য ব'ললেই হয়। সুতরাং পনেরো শ' সালের আগেকার বাঙলার স্বরূপ জানবার জন্যে,

পরবর্তী কালের অর্থাৎ ১৭।১৭ বা ১৮ শ সালের দিকে নকল-করা ১৫ শ’ খ্রীষ্টাব্দের আগেকার কবিদের লেখা বই-ই একমাত্র অবলম্বন। অনুমান হয় যে চণ্ডীদাস খ্রীষ্টীয় ১৪ শতকের শেষ পাদে জীবিত ছিলেন, তিনি হ’চ্ছেন পুরাতন বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর দু’ এক শ বছর পূর্বেও বাঙলায় কবি ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের পরে হ’চ্ছেন কৃত্তিবাস, বিজয়গুপ্ত, মালাধর বসু, বিপ্রদাস পিপলাই, শ্রীকরণ নন্দী প্রভৃতি। এঁরা সকলেই ১৫৫০-এর আগেকার লোক। কিন্তু এঁদের সময়ের পুঁথি নেই—পরবর্তী বিকৃত পুঁথি ই এঁদের সম্বন্ধে একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং বাঙলা ভাষার গতি আলোচনা ক’রতে গেলে এই কথাটি ই সর্বপ্রথম আমাদের চোখে খোঁচা দেয় যে, ১৬০০ সালের পূর্বেকার ভাষার খাঁটি নিদর্শনের একান্ত অভাব। বস্তুকে অবলম্বন ক’রেই ইতিহাস গ’ড়ে ওঠে। এখানে এই বস্তুর দৈন্যটা কেবলমাত্র জল্পনা-কল্পনা প্রশ্রয় দেয়, অবস্থাটা সত্য-সত্য কি ছিল তা’ জানতে দেয় না। বাঙলা সাহিত্যের পারম্পর্য বা ইতিহাস খ্রীষ্টীয় ১০ শ’ বা তার আগে গেলেও, ১৬ শ সালের আগেকার যুগের বাঙলা ভাষার অবিসংবাদিত নমুনা পাওয়া যায় না। জাতীয় গৌরবের অনুভূতিতে পূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিকের পক্ষে এরূপ অবস্থা বিশেষ আত্মপ্রসাদ জনক বা আশাপ্রদ নয়।

(৪)

তারপর, বাঙলা সাহিত্যের উৎপত্তি আর বিকাশ যে ক’বে হ’য়েছিল, সে সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট কথা বা কিংবদন্তী আমাদের সাহিত্যে নেই। চণ্ডীদাসের পূর্বে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৪ শতকের চতুর্থ পাদের পূর্বে, সবই অন্ধতমিস্রাচ্ছন্ন। আর পূর্বে অবশ্য বাঙালী গান বাঁধ্‌ত, কাব্য লিখ্‌ত, কিন্তু সেসব গান আর কাব্য লোপ পেয়ে’ গিয়েছে। পরবর্তী সাহিত্যে দুই-একটা নাম পাওয়া যায় মাত্র—যেমন ময়ূরভট্ট, কাণা হরিদত্ত, মাণিকদত্ত। হ’তে পারে এঁরা চণ্ডীদাসের আগেকার লোক, কিন্তু এঁদের সময়ের ভাষার নিদর্শন নেই, এঁরা যে কত প্রাচীন তার কোনও প্রমাণ নেই। বেহুলা-লখিন্দরের কথা, লাউসেনের

কথা, গোপীচাঁদের কথা, কালকেতু ধনপতি শ্রীমন্তের কথা,—এগুলি বাঙলার নিজস্ব সম্পত্তি ; রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের মতন এগুলি সুপ্রাচীন উত্তর-ভারতীয় হিন্দু জগতের কাছ থেকে, পৈতৃক রিক্থ হিসাবে প্রাপ্ত সম্পদ্ নয়। দেখছি যে, চণ্ডীদাসের পরে এই-সব কাহিনীকে আশ্রয় ক'রে বাঙলা সাহিত্যের গৌরব স্বরূপ কতকগুলি বড়ো বড়ো কাব্য লেখা হ'য়েছে। এই কাব্যগুলির আদি রূপ বা কাঠামো নিশ্চয়ই চণ্ডীদাসের পূর্বে বিদ্যমান ছিল ; কিন্তু এটা একটা প্রমাণ-সাপেক্ষ অনুমান মাত্র। নিদর্শনের অভাবে, চণ্ডীদাসের পূর্বেকার সাহিত্যের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অবশ্যম্ভাবী। কেউ-কেউ অতি আধুনিক বাঙলা গান ও ছড়া কিছু কিছু সংগ্রহ ক'রে সেই যুগে নিয়ে' গিয়ে একটা কাল্পনিক 'বৌদ্ধ যুগ' খাড়া ক'রে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস গড়তে চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু ঐ কাল্পনিক যুগের লেখক, বই, সন-তারিখ, এমন কি 'ঐতিহাসিক ব্যক্তি'টিও নিতান্তই কাল্পনিক

বাঙলা ভাষার ইতিহাস আলোচনার এই যে অবস্থা অর্থাৎ ১৬ শ' বা ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের পুঁথির অভাব, বাধ্য হ'য়ে বহুদিন ধ'রে আমাদের এই অবস্থাতেই আটকে থাকতে হ'য়েছিল ; অথবা কল্পনা দিয়ে' তার আগেকার ফাঁক পূরিয়ে' নেবার 'ঐতিহাসিক' আর 'সাহিত্যিক' অনুসন্ধান চ'লছিল। কিন্তু বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের পরম সৌভাগ্যের ফলে আজ বছর কুড়ি হ'ল দু'খানি বই আবিষ্কৃত আর প্রকাশিত হ'য়েছে, যে দু'খানিতে আমরা ১৫ শ' খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেকার বাঙলার খুব মূল্যবান্ নিদর্শন পেয়েছি। এই বই দু'খানি হ'চ্ছে, [১] চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, আর [২] প্রাচীন বাঙলা চর্যাপদ। প্রথমখানি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় আবিষ্কার করেন ; বাঁকুড়া জেলার এক গ্রামে, গোয়াল-ঘরের মাচার উপরে একটা ধামার ভিতরে আর পাঁচখানা বাজে পুঁথির সঙ্গে এই অমূল্য জিনিসটী ছিল। বসন্ত বাবুকে প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের ঘুণ বলা হ'য়েছে, এটা তাঁর যথাযথ বর্ণনা, এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ বাঙলা দেশে দ্বিতীয় ব্যক্তি আছেন ব'লে তো জানি না। তিনি সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালার কর্তা ছিলেন, তাঁর আবিষ্কৃত এই

বইখানি ১৩২৩ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে প্রকাশ করা হ'য়েছে। পুঁথিখানির অক্ষর দেখে প্রাচীন-লিপি-বিৎ স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির ক'রেছিলেন যে, এখানি ১৩৫০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে লেখা। কিন্তু অত প্রাচীন না হ'লেও, চর্য্যাপদের পুঁথির পরে বাঙলা ভাষার এমন প্রাচীন পুঁথি আর নেই। দুই-একজন সুপণ্ডিত সাহিত্যিক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে প্রতিকূল মত দিয়েছেন; কিন্তু তাঁদের সংশয় অমূলক ব'লে আমার মনে হয়। বইখানির ভাষা খুঁটিয়ে আলোচনা ক'রে আমার এই ধ্রুব বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, এর ভাষা ১৪০০ বা ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের এ-দিকের কিছুতেই হ'তে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা-বিষয়ক কাব্য কবি নিজেকে বাসলীর সেবক বড়ু চণ্ডীদাস ব'লে ভণিতায় উল্লেখ ক'রেছেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদের মধ্যে মাত্র দুই একটীর সঙ্গে এর পদের পুরা মিল পাওয়া যায়। ভাষা- বা ভাব-গত মিলের স্বল্প আরও কতকগুলি পদে আছে। এর ভাষা সাধারণতো চণ্ডীদাসের প্রকাশিত পদাবলীর ভাষার সঙ্গে মেলে না। কিন্তু সেটা স্বাভাবিক, কারণ মুখে গীত হওয়ায় আর নিরঙ্কুশ আর সাধারণতো অর্দ্ধশিক্ষিত গাথরিয়া বা নকল-নবীসের হাতে প'ড়ে, মূল কবির ভাষা এই ৪।৫ শ' বছরের মধ্যে যে ব'দলে যাবে তা নিঃসংশয়। কেউ-কেউ বলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লেখক চণ্ডীদাস আর পদাবলীর চণ্ডীদাস দু'জন আলাদা কবি, এক লোক নন। আবার কারো মতে দুই-এর বেশী চণ্ডীদাস ছিলেন; এটা খুবই সম্ভব; কিন্তু এখন সে কথায় আমাদের কাজ নেই কারণ আমরা ভাষার ইতিহাস আলোচনা ক'রছি, সাহিত্য নয়। এইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আমরা ১৪-র শতকে বা তার কিছু পরে লেখা মূল পুঁথি পাচ্ছি, এতে ঐ যুগের ভাষা -সাহিত্য বা গানের ভাষা মিলছে; তা' যার ই লেখা হোক্ না কেন', ক্ষতি নেই। এই বই পাওয়ার ফলে, ১৫৫০ সাল থেকে আরও ১৫০।২০০ বছর আগেকার বাঙলা ভাষার দলিল মিলল, তার ইতিহাসের বুনিয়াদ আরও পাকা হ'ল।

তারপর চর্য্যাপদের কথা ধরা যাক্। ১৩২৩ সালে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে আনা 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নাম দেওয়া এক খানা পুঁথি, অন্য তিন খানা পুঁথির সঙ্গে একত্র ছাপিয়ে', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নাম দিয়ে' প্রকাশিত করেন। বাঙ্লা ভাষার আলোচনায় এই চারিখানি পুঁথির মধ্যে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'-এর বিশেষ স্থান আছে।—অন্য তিনখানির ভাষা বাঙলা নয়, সুতরাং সেগুলির বিষয়ে এখানে এখন কিছু ব'লবো না। চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়ে গোটা পঞ্চাশেক গান আছে, এই গানগুলিকে 'চর্য্যা' বা 'চর্য্যাপদ' বা 'পদ' বলে, আর এগুলির ভাষাকে পুরানো বাঙলা ব'লতে হয়; আর এই গানগুলির উপর একটা সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলির বিষয় হ'চ্ছে, বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অনুষ্ঠান আর সাধন—সব হেঁয়ালীর ভাবে লেখা, বাইরে এক রকম মানে, তত্ত্ব কোনও গভীর বা বোধগম্য অর্থ হয় না; ভিতরে দার্শনিক কথা বা সাধন-প্রক্রিয়ার কথা আছে। এর সন্ধান বাইরের লোক—যারা ঐ সাধন-পথের গুহ্য তত্ত্ব জানে না—তাদের পাওয়া কঠিন। যে পুঁথিতে চর্য্যাপদগুলি পাওয়া গিয়েছে, তার বয়স শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথির চেয়ে খুব বেশী নয়; কিন্তু যে গানগুলি এতে রক্ষিত আছে, সেগুলির বয়স আরও প্রাচীন। এই চর্য্যাপদগুলির ভাষা আলোচনা ক'রে আমার নিজের ধারণা এই হ'য়েছে যে, এই গানগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চেয়ে অন্ততো দেড় শ' বছর আগেকার;—দু'-চারটী বিষয় থেকে অনুমান হয় যে, যাঁরা এই গান লিখেছিলেন তাঁরা খ্রীষ্টীয় ৯৫০ থেকে ১২০০-র মধ্যে জীবিত ছিলেন। এতে সব চেয়ে প্রাচীন বাঙলার খানিকটা নিদর্শন পাচ্ছি। কিন্তু কোনও কোনও স্থল থেকে তর্ক উঠেছে, এই চর্য্যাপদগুলির ভাষা সত্য-সত্য বাঙলা কিনা। কিছু কাল হ'ল শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় নোতুন ক'রে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন, আর এর ভাষা যে বাঙলা নয়, সে পক্ষে তাঁর যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তাঁর আপত্তির বিচার বা খণ্ডন করা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর হবে না; তবে

দাঁড়িয়েছে যে, এর ভাষা বাঙলা-ই বটে, কিন্তু কতকগুলি কারণে এতে পশ্চিমা-অপভ্রংশের দু'-চারটে রূপ এসে গিয়েছে—তাতে কিন্তু এর ভাষার 'বাঙলা-ত্ব' যায় না। চর্য্যাপদ পাওয়ার ফলে বাঙলা ভাষার আর একটা মূল্যবান্ দলিল বা'র হ'ল, বাঙলা ভাষার বিকাশ আর গতি নিয়ে বিচার করবার উপযুক্ত বস্তু মিল্‌ল—মোটামুটী খ্রীষ্টীয় ১০০০ সাল পর্য্যন্ত আমাদের ভাষা আর সাহিত্যের প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া গেল।

(৫)

এর পূর্ব্বের যুগে কিন্তু বাঙলা ভাষা-সম্বন্ধে কোনও খবর আমরা পাই না। খ্রীষ্টীয় ১০০০ সালের পূর্ব্বে বাঙলাদেশের ভাষায় লেখা কোনও বই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তখন অবশ্য বাঙলা ভাষা বা তার আদিম-রূপ হিসেবে একটা-কিছু বিদ্যমান ছিল,—কিন্তু সেই ভাষার কোনও নিদর্শন বড়ো একটা পাচ্ছি না। আগে হিন্দু-আমলে রাজারা আর অন্যান্য বড়ো লোকেরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করতেন এই সব দান, দলিল ক'রে দান-পত্র ক'রে দেওয়া হ'ত দলিল লেখা হ'ত তামার পাতে, অক্ষরগুলি খুদে' দেওয়া হ'ত, আর তাতে অনেক সময়ে তামায় ঢালা রাজার লাঞ্ছন বা চিহ্ন থাক্‌ত। এইরূপ দলিল বা তাম্রশাসন অনেক পাওয়া যায়। সব চেয়ে প্রাচীন তাম্রশাসন বাঙলাদেশে যা এ পর্য্যন্ত বেরিয়েছে সেটী হ'চ্ছে উত্তর-বঙ্গে ধানাইদহে প্রাপ্ত গুপ্ত-সম্রাট্ কুমারগুপ্তের সময়ের; এর তারিখ হ'চ্ছে খ্রীষ্টীয় ৪৩২-৪৩৩; এর পরে ধারাবাহিক ভাবে মুসলমান-যুগ পর্য্যন্ত, আর তা'র পরবর্ত্তী কালেরও, অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে; মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের বাঙলাদেশের ইতিহাস রচনায় এই তাম্রশাসনগুলি প্রধান সহায়। এখন, এই-সব দলিলে, দানের ভূমির পরিমাণ, গ্রামের নাম, আর জমীর চৌহদ্দী বা চতুঃসীমা নির্দ্দেশ করা থাকে। চৌহদ্দীর বর্ণনা করবার সময় মাঝে-মাঝে দু'-চারটে ক'রে তখনকার দিনে প্রচলিত জনসাধারণের ভাষার—অর্থাৎ বাঙলার প্রাকৃত ভাষার—নামও র'য়ে গিয়েছে। সেগুলিকে কোথাও-কোথাও একটু মেজে-ঘ'ষে দুই-একটী

উপসর্গ বা প্রত্যয় তাদের আগে-পিছনে জুড়ে দিয়ে', বাহ্যতো একটু সংস্কৃত ক'রে নেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে; কিন্তু এই সাজের মধ্যে থেকেও তাদের প্রাকৃত রূপটাকে বা'র করা প্রায়ই কঠিন হয় না ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব কালের বাঙলাদেশে ভাষা আলোচনা করবার একটা সাধন হ'চ্ছে এইরূপ কতকগুলি নাম। 'কণামোটিকা' অর্থাৎ-কিনা কানামুড়ী, 'রোহিতবাড়ী' অর্থাৎ রুইবাড়ী, 'নডজোলী' অর্থাৎ নাড়াজোল, 'চবটীগ্রাম' অর্থাৎ চটীগাঁ, 'সাতকোপা' অর্থাৎ সাতকুপী, 'হড়ীগাঙ্গ' অর্থাৎ হাড়ীগাঙ্, প্রভৃতি নাম, ভাষাতত্ত্বের উপজীবা হ'য়ে ওঠে। এই সব নাম থেকে বুঝতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ৪০০ থেকে ১০০০ পর্যান্ত এই সময়ের মধ্যে বাঙলাদেশে প্রাকৃত-শ্রেণীর একটা ভাষা বলা হ'ত, আর সেই ভাষার এমন বহুত শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি এখনও আমরা (অবশ্য একটু পরিবর্তিত রূপে) আজকালকার বাঙলায় ব্যবহার করি। প্রাচীন বাঙলার এই সকল নদ নদী-গ্রাম প্রভৃতির নাম বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌লে একটা বিষয় চোখে পড়ে; অনেক নামের ব্যাখ্যা সংস্কৃত বা কোন আর্য্যভাষা ধ'রে হয় না,—কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত, কেউ এখানে সাহায্য করে না; সেই সব নামের ব্যাখ্যার জন্ম আর্য্যভাষার গণ্ডীর বাইরে যেতে হয়—অনার্য্য দ্রাবিড় আর কোলের ভাষার সাহায্য নিতে হয়। 'অখডাচোবোল, দিজ্জমকাজোলী, বাল্লহিট্টা, পিণ্ডারবীটি-জোটিকা, মোড়ালন্দী, আউহাগড্ডী' প্রভৃতি নামের চেহারা কোনও আর্য্যভাষার নয়, আর 'পোল' বা 'বোল', 'জোটী', 'জোডী' বা 'জোলী', 'হিট্টী' বা 'ভিট্টী', 'গড্ড' বা 'গড্ডী' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ, প্রাচীন অনুশাসনে প্রাপ্ত বাঙলাদেশের স্থানীয় নামের মধ্যে মেলে। এইগুলি খুব সম্ভব দ্রাবিড় ভাষার শব্দ। জায়গার নামে এই সব অনার্য্য শব্দ দেখে, অনার্য্যদের বাস অনুমান ক'র্‌লে কেউ ব'ল্‌বে না এটা কেবল কল্পনা মাত্র।

কিন্তু এই-সব নাম তো ভাষার পূরো পরিচয় দেয় না; কাজেই বলা যেতে পারে যে, খ্রীষ্টীয় ১০০০ সালের পূর্ব্বেকার বাঙলা ভাষার পরিচায়ক তেমন বিশেষ কিছু নেই। চর্য্যাপদ থেকে আমাদের গিয়ে ঠেক্‌তে হয়

একেবারে মাগধী প্রাকৃতে। সংস্কৃত নাটকে নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখের কথা এই ভাষায় বলানো হ'ত। কিন্তু সংস্কৃত নাটক দেখে তো মাগধী প্রাকৃত বা অন্যান্য প্রাকৃতের তারিখ নির্ণয় করা চলে না বররুচি প্রাকৃত ভাষার যে ব্যাকরণ লেখেন, তাতে তিনি মাগধী-প্রাকৃত সম্বন্ধে দুটো কথা ব'লে গিয়েছেন। বররুচি খুব সম্ভব কালিদাসেরই সমসাময়িক ছিলেন খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে কোনও সময়ে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় বিদ্যমান ছিলেন ব'লে মনে হয়। বররুচি যে মাগধী-প্রাকৃত আলোচনা ক'রেছেন, সেটা হ'চ্ছে সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা ;—যে ভাষায় তখনকার দিনে মগধের লোকে কথাবার্তা ব'লত এরূপ ভাষা নয়। বরং তার ই দুই একটা বৈশিষ্ট্যকে ধ'রে গ'ড়ে-তোলা, ব্যাকরণিয়াদের নিয়ম দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা একটা ভাষা। যাই হোক্, বররুচির সাহিত্যিক মাগধী, বা সংস্কৃত নাটকের মাগধী, অন্ততো কিছু পরিমাণে কথিত মাগধীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই মাগধী ভাষা বররুচির আগে আর বররুচির পরেও, পূর্ব-ভারতে মগধে, কাশী বিহার অঞ্চলে বলা হ'ত। আর খুব সম্ভব আমাদের বাঙলাদেশে তখন যে আর্য্যভাষা প্রচলিত ছিল—সেই ভাষা ছিল এই মাগধী ই। তখন অবশ্য আমাদের এই বর্তমান বাঙলা ভাষা, বা যে ভাষা প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে পাই, সে ভাষার উদ্ভব হয়নি। এই মাগধী-প্রাকৃতের মধ্যে উচ্চারণ-গত একটী বিশেষত্ব ছিল, যা এর দৌহিত্রী-স্থানীয় বাঙলা এখনও রক্ষা ক'রছে—সেটী হ'চ্ছে ভাষায় 'শ ষ স'-স্থানে কেবল 'শ'। মাগধী-প্রাকৃতের পূর্বে এই দেশের আর্য্যভাষা যে অবস্থায় ছিল, তার পরিচয় পাই অশোকের অনুশাসনে, খ্রী-পূঃ তৃতীয় শতকে। অশোকের অনুশাসনগুলি ভারতের নানাস্থানে পাওয়া গিয়েছে। এগুলি প্রাকৃত ভাষায় লেখা স্থান-ভেদে অশোকের অনুশাসনের ভাষায় পার্থক্য আছে দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে শাহ্বাজ্‌গঢ়ী আর মান্‌সেহ্‌রার পাহাড়ের অনুশাসনের ভাষা একরকম, আবার গুজরাটের গিরনার অনুশাসনে আর একরকম, আবার পূর্ব-ভারতের নানা স্থানের অনুশাসন একেবারে অন্যরকমের প্রাকৃতে লেখা। অশোকের পূর্ব-ভারতীয় অনুশাসনাবলীর ভাষা—দুই-একটা খুঁটীনাটী বিষয়ে

ছাড়া—পরবর্তী কালের বররুচি কর্তৃক বর্ণিত আর সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত মাগধী-প্রাকৃতের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। কিন্তু অশোকের পূর্বী প্রাকৃতকে মাগধী-প্রাকৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ব'লে ধ'রে নিতে পারা যায়। কাজে-কাজেই, বাংলা ভাষার মূল, মাগধী প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে পূর্বী অশোক-অনুশাসনের ভাষায় গেলে পাওয়া যায়। অশোকের এই পূর্বী-প্রাকৃতে অবশ্য বাঙলা ভাষার যে ভবিষ্যৎ রূপ নিহিত আছে, সে রূপ তখনও প্রকট নয়, অপরিস্ফুট মাত্র। বাঙলা ভাষা এই পূর্বী প্রাকৃতের একটী বিকাশ, আর এই বিকাশ হ'তে হাজার বছরের উপর লেগেছিল। অশোক-যুগের আগে পূর্ব-ভারতে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তার আর নিদর্শন মেলে না; তবে তার সম্বন্ধে আমরা বৌদ্ধ পালি-সাহিত্য থেকে আর সংস্কৃত ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ থেকে একটু-একটু আন্দাজ ক'রতে পারি। অশোক বা মৌর্য্যবংশের পূর্বে খুব সম্ভব বাঙলাদেশে আর্য্যভাষার বিস্তার হয়নি; বুদ্ধদেবের সময়েও বোধ হয় মগধ আর চম্পার পূর্বদিকে আর্য্যভাষা আসেনি। বুদ্ধদেবের সময় হ'চ্ছে ব্রাহ্মণ-যুগের অবসান-কালে। এই সময়ে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৫০০ র দিকে, ভারতে কথিত আর্য্য ভাষা দেশভেদে তিনটী ভিন্ন রূপ ধারণ ক'রেছিল—[১] উদীচ্য, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত আর পাঞ্জাবে বলা হ'ত; [২] মধ্য-দেশীয়, কুরু-পাঞ্চাল দেশে (এখনকার যুক্ত-প্রদেশের পশ্চিম অংশে) বলা হ'ত; আর [৩] প্রাচ্য—কোশল, কাশী, মগধ, বিদেহে প্রচলিত ছিল। এই প্রাচ্য-আর্য্য-ই কালে অশোক-যুগের পূর্বী-প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে' মাগধী-প্রাকৃতে পরিবর্তিত হয়। বুদ্ধদেবের কালের বা তার আগেকার এই প্রাচ্য ভাষা, বৈদিক ভাষার একটী অর্বাচীন রূপ মাত্র।

বৈদিক সময় থেকে আর্য্যভাষা তা-হ'লে এই পথ ধ'রে চ'লে বাঙলা ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; আমরা ঐ পথের সম্বন্ধে পর পর এই নির্দেশ পাচ্ছি:—

[১] ভারতে প্রথম আসে বৈদিক বা ঋগ্বেদের যুগের ভাষা; পাঞ্জাবে এই ভাষা প্রচলিত ছিল; খ্রীঃ-পূঃ ১০০০-এর আগেকার কালের বৈদিক সূক্তে এই ভাষার মার্জিত সাহিত্যিক রূপ দেখি, আর এই ভাষার নানা কথিত রূপ সম্বন্ধে আভাস পাই ঋগ্বেদে, আর পরবর্তী অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে।

[২] তারপর আর্যভাষা পাঞ্জাব থেকে উত্তর-ভারতে, গঙ্গা-যমুনার দেশে যুক্ত-প্রদেশে, আর বিহার অঞ্চলে প্রসারিত হ'ল, খ্রীঃ-পূঃ ১০০০ থেকে ৬০০ র মধ্যে। এই সময়ে বৈদিক ভাষার ব্যাকরণের জটিলতা একটু সরল হ'তে শুরু ক'রলে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই যুগের ভাষার সাহিত্যিক আর পশ্চিম-অঞ্চলে কথিত রূপের প্রচুর নিদর্শন পাই; আর পূর্ব অঞ্চলের প্রাদেশিক কথিত ভাষার সম্বন্ধে এই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে কিছু-কিছু আভাস পাই; তা' থেকে বুঝতে পারা যায় যে, পূর্ব অঞ্চলে যে আর্যভাষা বলা হ'ত, প্রথমে তাতে-ই আদি যুগের আর্য ভাষার ভাঙন ধরেছিল; প্রাকৃতের সৃষ্টি প্রথমে পূর্ব-দেশে-ই হয়। পূর্ব-দেশের এই প্রাচ্য ভাষার কোনও নিদর্শন পাই না, কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে কতকগুলি প্রাচ্য ভাষার রীতি-অনুমোদিত শব্দ রক্ষিত হ'য়ে আছে—যথা, 'বিকট, ক্ষুল্ল, শিথিল, মল্ল, দণ্ড, গিল্' প্রভৃতি। এই সব শব্দ থেকে' আর অন্য প্রমাণের সাহায্যে জানা যায় যে, অতি প্রাচীন কালেই আদি আর্য-ভাষার 'র' 'ল' দুই ই পূর্ব অঞ্চলের কথা ভাষায় বা প্রাকৃতে কেবল 'ল' হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

[৩] এর পরে দেখি, প্রাচ্য-অঞ্চলের এই ভাষা, পুরোপুরি প্রাকৃত রূপ নিয়ে', দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছে—এক, পশ্চিম-খণ্ডের প্রাচ্য; আর দুই, পূর্ব-খণ্ডের প্রাচ্য—মগধে বলা হ'ত ব'লে যেটার 'মাগধী' এই নাম দেওয়া হ'য়েছে। অশোকের অনুশাসনে এই পশ্চিমা-প্রাচ্যেরই নিদর্শন পাই। পূর্বী-প্রাচ্যের সঙ্গে পশ্চিমা-প্রাচ্যের তফাৎ খালি এই জায়গাটাতে যে, পূর্বীতে সব জায়গায় তালব্য 'শ' ব্যবহার হ'ত, আর পশ্চিমে কিন্তু তালব্য 'শ'-র ব্যবহার ছিল না, তার জায়গায় দন্ত্য 'স'-র ব্যবহার ছিল। 'র' এই দুইয়েই ছিল না, ছিল কেবল 'ল'। দুই-একটী ছোটো শিলা আর মুদ্রা-লেখে এই পূর্বী-প্রাচ্য বা মাগধী-প্রাচ্যের নিদর্শন পাই, এগুলি অশোক-যুগের; এগুলির মধ্যে ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড়ের 'শুতনুকা (='সুতনুকা)'-লিপি সব চেয়ে মূল্যবান্। খুব সম্ভব খ্রীঃ-পূঃ চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে, মৌর্যদের কালে, এই পূর্বী-প্রাচ্য বাঙলাদেশে তার জড় গাড়্তে সমর্থ হয়।

[৪] পরবর্তী কালের এই মাগধী প্রাকৃতের একটী সাহিত্যিক নিদর্শন পাই—সংস্কৃত নাটকে আর বররুচির ব্যাকরণে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যেই বাঙলাদেশে এই প্রাকৃতের যথেষ্ট প্রসার হ'য়েছিল ব'লে অনুমান করা যায়।

[৫] তারপর কয় শতাব্দী ধ'রে সব চুপ-চাপ,—বাঙলাদেশে বা মগধে দেশভাষা চর্চার কোনও চিহ্ন নেই—তাম্রশাসনে দুই-একটা নাম ছাড়া আর কিছুই মেলে না। এই সাত শ' বছর ধ'রে মাগধী-প্রাকৃত আস্তে-আস্তে ব'দলে যাচ্ছিল—বিহারী (ভোজপুরে' মৈথিল মগহী), বাঙলা আর আসামী, আর উড়িয়াতে ধীরে ধীরে প'রিণত হ'চ্ছিল।

[৬] এর পরের ধাপে আমাদের একেবারে বাঙলা ভাষার সীমানার মধ্যে পৌঁছিয়ে' দিলে—১০০০ খৃষ্টাব্দের দিকে চর্য্যাপদের কালে, নবীন বাঙলা ভাষার উদয় হ'ল।

[৭] তারপরে ১২০০ খৃষ্টাব্দে, তুর্কীদের দ্বারা ভারত আর বাঙলাদেশের আক্রমণ আর জয়—বাঙলার স্বাধীনতার নাশ। দু' শ' বছর ধ'রে বাঙলা ভাষার কোনও খোঁজ-খবর নেই। বোধ হয় অশান্তি আর অরাজকতা তখন দেশব্যাপী হ'য়ে ছিল। তারপরে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর চণ্ডীদাসের আবির্ভাব, আর বাঙলা সাহিত্যের নব জাগরণ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' এই যুগের ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

[৮] ১৪০০-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের বাঙলা ভাষার অনেকটা পরবর্তী যুগের পুঁথিতে রক্ষিত হ'য়ে আছে। তার পর থেকে বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ অবস্থা, পুঁথির আর অন্ত নেই। এই শতকের পর থেকে, যখন চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙলায় বড়োদরের একটা সাহিত্য আর চিন্তা-ধারা দাঁড়িয়ে' গেল, তখন থেকে বাঙলা ভাষার গতি পর্য্যবেক্ষণ করা অতি সোজা।

বাঙলা ভাষার ইতিহাসে কিন্তু যে ক'টা মস্ত ফাঁক থেকে যাচ্ছে, সেগুলো কিরূপে পূরণ ক'রে এই ইতিহাসকে আমরা গ'ড়ে তুলতে পারি? ভাষার ক্রমিক বিবর্তন দেখাতে হ'লে সেগুলোকে টপকে' বা ডিঙিয়ে' তো যাওয়া যেতে পারে না, কারণ সে-সমস্ত যুগের মধ্য দিয়েও ভাষা স্রোত অব্যাহত

গতিতে চ'লে এসেছে।—এখানে তুলনা-মূলক পদ্ধতির সাহায্য আমাদের নিতে হবে। আগেই ব'লেছি যে, মাগধী-প্রাকৃতের কাল থেকে চর্যাপদের কাল, মোটামুটী খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দশম শতক—এই সাত শ' বছরের বাঙলা ভাষার কোনও নিদর্শন বা অবশেষ নেই। এই সাত শ' বছরের ইতিহাস তুলনা মূলক পদ্ধতির দ্বারা কিরূপে পুনর্গঠিত ক'রতে পারা যায়? এই সাত শ' বছরের মধ্যে মাগধী-প্রাকৃত কোন্ ধারায় পরিবর্তিত হ'য়ে বাঙলার রূপ ধ'রে ব'সেছে?—সে সম্বন্ধে একটু আভাস পেতে পারি, মাগধী-প্রাকৃতের সমকালীন আর তার স্বস্থ-স্থানীয় শৌরসেনী-প্রাকৃত কেমন ক'রে ধীরে ধীরে শৌরসেনী অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে হিন্দীতে রূপান্তরিত হ'য়েছে, তা'ই দেখে'। শৌরসেনী প্রাকৃত মথুরা-অঞ্চলে বলা হ'ত; বররুচি এর বর্ণনা ক'রে গিয়েছেন, আর সংস্কৃত নাটকেও এই প্রাকৃত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। বররুচির ব্যাকরণ আর সংস্কৃত নাটকের শৌরসেনী, পরবর্তী যুগে, ষষ্ঠ শতাব্দীর পর থেকে' পরিবর্তন-ধর্মের নিয়ম-অনুসারে অন্য মূর্তি গ্রহণ করে; আর, একটী সুবৃহৎ গীতি- ও কাব্য-সাহিত্যে শৌরসেনীর এই অর্বাচীন অবস্থা আমরা দেখতে পাই। পরবর্তী যুগের এই শৌরসেনীকে 'শৌরসেনী-অপভ্রংশ' বা খালি 'অপভ্রংশ' বলা হয়। একদিকে প্রাকৃত আর অন্যদিকে আধুনিক আর্যভাষা হিন্দী, আর শৌরসেনী-অপভ্রংশ হ'চ্ছে এই দুইয়ের সন্ধি-স্থল; শৌরসেনী-অপভ্রংশ থাকায়, বেশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, কি রকম পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে প্রাকৃত আধুনিক ভাষায় পরিণত হ'ল। এখন যদি মাগধী-প্রাকৃত আর প্রাচীন বাঙলার মধ্যে (শৌরসেনী অপভ্রংশের মতন) উভয়ের সংযোগ-স্থল এক 'মাগধী-অপভ্রংশ'-র নিদর্শন পেতুম,—'মাগধী-অপভ্রংশ' নাম যাকে দেওয়া যেতে পারে এমন ভাষা যদি কোন সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে থাকত, তা-হ'লে বাঙলার উৎপত্তি নির্ধারণ করবার উপযোগী কতটা না মাল-মশলা আমাদের হাতে আসত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তুর্কী বিজয়ের পূর্বে সাত শ' বছর ধ'রে বাঙলাদেশের পণ্ডিতেরা দেশ-ভাষার দিকে নজর দেন নি, তাতে বিশেষ কিছু লেখেন নি, সব লিখেছেন

দেব-ভাষা সংস্কৃতে ;—আর চিত্ত-বিনোদের জন্তে বা দেবতার আরাধনার জন্তে ভাষায় জন-সাধারণ যে গান কবিতা আর স্তোত্র প্রভৃতি নিশ্চয়ই লিখ্‌তে, সেগুলি প্রায় সব লোপ পেয়েছে। ভাষার ইতিহাস আলোচনার যুক্তি-অনুসারে, মাগধী-প্রাকৃত আর বাঙলা ভাষা, এই দুইয়ের সন্ধি স্থল-স্বরূপ একটা মাঝের অবস্থা আমাদের স্থাপিত ক'রতে হয়, আর তাকে 'শৌরসেনী-অপভ্রংশ'-র নজারে 'মাগধী-অপভ্রংশ' নাম দিতে হয়। আর যুক্তি তর্ক আর ভাষাতত্ত্বের নিয়ম খাটিয়ে' পৌর্বাপর্য্য বিচার ক'রে, এই মাঝের অবস্থার—আমাদের কল্পিত এই মাগধী-অপভ্রংশের—রূপটী কি রকম ছিল, তা-ও আমাদের স্থির ক'রতে হবে। অবশ্য যাঁরা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন নি, তাঁদের চোখে এই ব্যাপারটী একটু কুটিল ঠেক্‌বে,—কিন্তু এটা হ'চ্ছে ভাষাতত্ত্বের সকল নিয়ম-কানুন বা সূত্র বা পদ্ধতির অনুমোদিত পথ। সূত্র যেখানে ছিন্ন, সেখানে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে', ছিন্ন অংশকে একরকম পুনরুজ্জীবিত ক'রে নিয়ে', অবিচ্ছিন্ন যোগ বা বিকাশের গতি দেখাতে হবে—ভাঙাকে এই ভাবে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে।

বাঙলার বংশপীঠিকা তা-হ'লে দাঁড়াচ্ছে এই :—বৈদিক কথিত ভাষার রূপভেদ > প্রাচ্য-অঞ্চলের কথিত ভাষা > কথিত মাগধী-প্রাকৃত > মাগধী-অপভ্রংশ > প্রাচীন বাঙলা > মধ্যযুগের বাঙলা > আধুনিক বাঙলা। বাঙলা ভাষার ইতিহাস চর্চা ক'রতে হ'লে, এই কয় ধাপের প্রত্যেকটীর স্থান আর বৈশিষ্ট্য বেশ ক'রে বুঝে' নিয়ে', এদের সঙ্গে পরিচয় দরকার। মানসিক চিন্তার বিষয়ীভূত হ'লেও, ভাষা মুখ্যতো একটা প্রাকৃতিক বস্তু ; আর প্রাকৃতিক বস্তুর মতো এর বিকাশ কার্য্য-কারণাত্মক নিয়ম ধ'রেই হ'য়েছে, সে কথা আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে। এ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বল্‌বার স্থান এ নয় ;—তবে বাঙলা ভাষার উৎপত্তির আর বিকাশের গতি দেখাবার জন্তে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে আধুনিক বাঙলার নিদর্শন হিসেবে দু'টী ছত্র উদ্ধার ক'রে, বাঙলা ভাষার পূর্ব পূর্ব যুগে এই দুই ছত্রের প্রতিরূপ কি রকম ছিল, বা থাকা সম্ভব ছিল, তাই দেখ্‌বার প্রয়াস করা গেল। ছত্র দু'টী সর্বজন-পরিচিত—'সোনার তরী' কবিতা থেকে নেওয়া—'গান গেয়ে তরী

বেয়ে কে আসে পারে, দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।' আলোচনার সুবিধার জন্যে, তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ 'তরী'-কে বাদ দিয়ে তার জায়গায় নৌকা-বাচক তদ্ভব শব্দ 'না'-কে বসানো গেল ; আর প্রাচীন রূপ 'উহারে'-কে বর্জন ক'রে আধুনিক 'ওরে'-কে নেওয়া হ'ল (নীচে বাঙলার পূর্বেকার স্তর হিসাবে যে পুনর্গঠিত রূপ দেখানো হ'চ্ছে, তাতে কোনও পদের পূর্বে, * বা তারকাচিহ্ন দেখ্‌লে বুঝ্‌তে হবে যে, সেই পদ কোনও বইয়ে মেলে নি, কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে সেই রকম পদের অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস ক'র্‌তে হয়—এই প্রকার সম্ভাব্য রূপের আধারের উপর পরবর্তী প্রয়োগ প্রতিষ্ঠিত।)

আধুনিক বাংলা (খ্রীষ্টাব্দ ১৯৩৬)	গান্ গেয়ে না বেয়ে কে আসে [= আশে] পারে ; দেখে যেন [= জ্যানো] মনে হয়, চিনি ওরে।
মধ্যযুগের বাংলা (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ)	গা'ন্ গায়্যা (গাইআ) নাও বায়্যা (বাইআ) কে আশ্যে (আইশে) পারে ; দেখ্যা (দেইখ্যা) *জেন্‌অ (জেন্‌হ, জেহেন) মনে হোএ, *চিনী (চিন্‌হীয়ে) *ওআরে (ওহারে)।
প্রাচীন বাংলা (আনুমানিক ১১০০ খ্রীঃ)	গাণ গাহিআ নাব বাহিআ কে আইশই পারহি ; দেখিআ *জৈহণ মণে (মণহি) হোই, *চিণ্‌হিঅই *ওহারহি।
মাগধী-অপভ্রংশ (আনুমানিক ৭০০ খ্রীঃ)	গাণঁ গাহিঅ নাবঁ বাহিঅ *কই (*কি) আবিশই পারহি (পালহি) ; দেক্‌খিঅ *জইহণঁ (জইশণঁ) মণহি হোই, *চিণ্‌হিঅই *ওহঅরহি (*ওহঅলহি)।
মাগধী-প্রাকৃত (আনুমানিক ২০০ খ্রীঃ)	গাণং গাধিঅ (গাধিত্তা) নাবং বাহিঅ (বাহিত্তা) *কগে (*কএ, বা কে) আবিশদি *পালধি (পালে) ; দেক্‌খিঅ (দেক্‌খিত্তা) *যাদিশণং *মণধি হোদি (ভোদি), চিণ্‌হিঅদি *অমুশ্‌শ কলধি (= অমুশ্‌শ কলে)।

* আদিযুগের প্রাচ্য-প্রাকৃত (আনুমানিক ৮০০ খ্রীঃ-পূঃ) — গামং গচ্ছন্তা নাবং আরুহন্তা *ককে (কে) আগ্রিশতি *পালধি (পালে) ; দেক্খিঅ বালিশং (*বালিশনং) *মনধি (মনসি) হোতি (ভোতি), চিন্তিয়তি অমুশশ কতে।

কথ্য বৈদিকের রূপ-ভেদ (আনুমানিক ১০০০ খ্রীঃ-পূঃ) — গামং গাম্স্যিন্ত নাবং আরুহ্যন্তঃ *ককঃ (= কঃ) আগ্রিশতি *পারেধি (= পারে) ; *দৃক্ষিত্বা (= দৃষ্ট্বা) বালিশম্ *মনোধি (মনসি) ভবতি, *চিন্তাতে অমুষ্য কৃতে (= অসৌ অস্মাভির জায়তে)।

এর পূর্বে, ঋগ্বেদের আগে, ভাষার যে-যে অবস্থা বা স্তর ছিল, সেই প্রাক্-বৈদিক অবস্থা বা স্তর গুলিকেও আমরা প্রাচীন ঈরানীয়, গ্রীক, লাতীন, কেলটিক, স্লাব, আর জর্মানিক ইত্যাদির সাহায্যে পুনর্গঠিত ক'রতে পারি।

সাধারণ ভাবে আমাদের ভাষার উৎপত্তি-সম্বন্ধে দু'টো মোটা কথা ব'ললুম। এ-ছাড়া, বাঙালী শিক্ষিত জনের অবশ্য-জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় আছে,— যেমন খাঁটী বা বিশুদ্ধ বাঙলা ব'ল্‌লে কি বুঝ্‌তে হবে ; বাঙলায় সংস্কৃতের স্থান কি প্রকারের, আর কতটা ; বাঙলা ভাষার উপর অনার্য্য প্রভাব, মুসলমান আর বাঙলা ভাষা ; বাঙলা ভাষার আধুনিক গতি আর তার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আশা-আকাঙ্ক্ষা ;—এর প্রত্যেকটী নিয়েই অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু এখন সে সময় নেই। আমাদের ব্যক্তিগত আর জাতীয় জীবনের অনেকখানি এই ভাষাকে অবলম্বন ক'রে। যে-যে আলোচ্য বিষয়ের কথা আমি উল্লেখ ক'রলুম, সে সবগুলিরই গুরুত্ব শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন। সে সম্বন্ধে কিছু বিচার ক'রতে গেলে বা মত দিতে হ'লে, বাঙলা ভাষাতত্ত্ব আর বাঙলা ভাষার আলোচনার যে মূল্য আছে, সে কথা সকলেই স্বীকার ক'রবেন।

(৬)

এইবার অতি সংক্ষেপে বাঙালী জাতির আর সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে গোটাকতক কথা ব'লে আমার প্রবন্ধ শেষ ক'রবো। নৃতত্ত্ব-বিদ্যার সাহায্যে এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চ'লছে। কিন্তু নৃতত্ত্ব-বিদ্যা যে কালের কথা নিয়ে আলোচনা ক'রছে, সেটা হ'চ্ছে এক রকম প্রৈতিহাসিক কালের কথা। বাঙালী জাতির সৃষ্টিতে এই কয়টী বিভিন্ন মূল জাতির উপাদান নাকি এসেছে:—[১] লম্বা আর উঁচু মাথা-ওয়ালা একটী জাতি North Indian 'Aryan' Longheads. এই জাতিটাই হ'চ্ছে আর্য্য ভাষী জাতি, এই হ'ল অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিদের মত—পাঞ্জাবে, রাজপুতানায়, উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এই শ্রেণীর শারীরিক সংস্থানটা খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়; কিন্তু বাংলাদেশের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এইরূপ লম্বা-মাথা-ওয়ালা লোক বেশী মেলে না—অতি অল্প-স্বল্প যা কিছু পাওয়া যায়। [২] লম্বা আর নীচু মাথা-ওয়ালা একটী জাতি—South Indian or Dravido-Munda Longheads. আধুনিক দক্ষিণ-ভারতের (তামিল দেশের) দ্রাবিড় ভাষীরা, আর কোল-জাতীয় লোকেরা এই শ্রেণীতে পড়ে। বাংলাদেশের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এই-জাতীয় মস্তকাকৃতি বিশুদ্ধ ভাবে কিছু কিছু পাওয়া যায়। [৩] গোল-মাথা-ওয়ালা একটী জাতি—Alpine Shortheads: এদের সরল নাক, মুখে দাড়ী-গোঁফের প্রাচুর্য্য; সিন্ধু প্রদেশে, গুজরাটে, মধ্য-ভারতে, কর্ণাটকে, অন্ধ্রে-ও এদের বাস ছিল,—এইরূপ মস্তকাকৃতির লোক ওই সব দেশে এখনও বেশী ক'রে দেখা যায়; বাংলাদেশে এইরূপ লোকেরই প্রাচুর্য্য বেশী, বিশেষ ক'রে ভদ্রজাতির মধ্যে;—সাধারণ বাঙালী গোল-মাথা-ওয়ালা—পাঞ্জাবীদের মতন লম্বা মাথা-ওয়ালা নয়; এই গোল-মাথা-ওয়ালা জাতি আদিম অবস্থায়, বৈদিক যুগের পূর্ব্বে, ভাষায় আর সভ্যতায় কি ছিল তা এখনও জানা যায় নি, আর এরা কবে, কোথা থেকে, ভারতবর্ষে এসেছিল, তাও জানা যায় নি; তবে এদের অনুরূপ গোল-মাথা ওয়ালা জাতি ভারতের বাইরে বহু দেশে পাওয়া যায়। [৪] গোল-মাথা-ওয়ালা আর একটী জাতি—

Mongolian Shortheads ; এরা মোঙ্গোল জাতীয় লোক, নাক চেপ্টা, গালের হাড় উঁচু, গোঁফ-দাড়ী কম, উত্তর- আর পূর্ব বঙ্গের বাঙালী জন-সাধারণের মধ্যে এই উপাদান বেশী ক'রে পাওয়া যায়। এই চার প্রকার জা'তের মিশ্রণে আধুনিক বাঙালী। এই চার জা'ত ছাড়া, দক্ষিণ-ভারতের আর এশিয়ার অন্যান্য ভূভাগের মতন, বাঙলাদেশে Negrito 'নিগ্রোবটু' (অর্থাৎ 'ক্ষুদ্রাকার নিগ্রো') অথবা Negroid অর্থাৎ 'নিগ্রো-রূপ' পর্য্যায়ের জাতির অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কেনও প্রমাণ মেলে না, বাঙালী জাতিতে এই উপাদান খুব সম্ভব নেই। (কিন্তু বাঙলার প্রত্যন্তদেশে, রাজমহল পাহাড়ের দ্রাবিড়-ভাষী 'মালের্' বা 'মাল-পাহাড়ী' জাতির মধ্যে, আর আসামের নাগাদের মধ্যে, নিগ্রোবটু বা নিগ্রো-রূপ জাতির কিছু কিছু মিশ্রণের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।) Risley রিজ্‌লিপ্রমুখ দুই একজন নৃতত্ত্ববিৎ মনে ক'র্‌তেন যে, প্রধানতো [২] আর [৪]-এর সংমিশ্রণ হওয়ায় গোল-মাথা-ওয়ালা বাঙালী জাতির উৎপত্তি। কিন্তু এই মত এখন সকলে মানেন না।

যাই হোক্, উপরে নির্দিষ্ট এই চার মৌলিক জাতির সংযোগে বা সংমিশ্রণে আধুনিক বাঙলা-ভাষী জন-সমষ্টির উদ্ভব—এটা হ'চ্ছে মোটামুটি ভাবে নৃতত্ত্ববিদ্যার আবিষ্কার। এতে ভাষা- বা সভ্যতা-সম্বন্ধে কিছু বলা হ'ল না—খালি মানুষের দেহের সমাবেশ নিয়ে' তার মৌলিক জা'ত স্থির করবার প্রয়াসের উপর এই আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত। [১]-শ্রেণীর লোকেরা-ই যে বৈদিক আর্য্যভাষী,—উত্তর-ভারতের পাঞ্জাবে রাজস্থানে যুক্ত-প্রদেশে আধুনিক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতিদের পূর্ব-পুরুষ, এটা এখন একরকম সর্ববাদিসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হ'য়েছে। কিন্তু বাঙালীর মধ্যে, এমন কি উচ্চ-শ্রেণীর বাঙালীর মধ্যেও, এই শ্রেণীর মানুষ অপেক্ষাকৃত অনেক কম—এটা একটা প্রণিধান-যোগ্য বিষয়। [২]-শ্রেণীর লোকেরা যে তামিল- আর কোল-ভাষী জাতিদের অনেকের পূর্বপুরুষ, এটাও মানা হয়। বাঙলাদেশে নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে এইরূপ আকৃতি পাওয়া যায়, একথা আগেই ব'লেছি [৪]-শ্রেণীর লোকেরা, বাঙলা-ভাষী হ'য়ে বাঙালী জাতির অঙ্গীভূত হবার পূর্বে, অন্ততো

বেশীর ভাগ যে ভোট-চীনা গোষ্ঠীর ভাষা ব'লত, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার বিশেষ কিছু নেই।

খালি মুস্কিল হ'চ্ছে [৩]-শ্রেণীর Alpine Shortheads-দের নিয়ে'। এদের ভাষা কি ছিল? দ্রাবিড়, না কোল, না আর্য্য, না ভোট-চীনা—না অধুনা-লুপ্ত আর কোনও ভাষা-গোষ্ঠীর ভাষা? ভারতে অধুনা বিদ্যমান এই চারিটী ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে, খুব সম্ভব কোল ভাষা সব-চেয়ে আগেকার কাল থেকে ভারতবর্ষে বলা হ'ত, এইরূপ অনুমান হয়। দ্রাবিড় ভাষা তার পরে আসে, আর তার পরে আর্য্য আর ভোট-চীনা। এই চারটী গোষ্ঠী ব্যতিরেকে, পঞ্চম কোনও ভাষা-গোষ্ঠীর অস্তিত্ব-সম্বন্ধে প্রমাণ এখনও কিছু পাওয়া যায় নি; হয়-তো পরে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু [৩]-শ্রেণীর Alpine Shortheads-দের ভাষা সম্বন্ধে এখন কী অনুমান করা যেতে পারে? শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তাঁর Indo-Aryan Races নামক অতি মৌলিক তথ্যপূর্ণ নৃতত্ত্ববিদ্যা-বিষয়ক বইয়ে অভিমত প্রকাশ ক'রেছেন যে, আমাদের [৩]-শ্রেণীর এই Alpine Shortheads-রা, [১] শ্রেণীর লোকেদের মত আর্য্যভাষী-ই ছিল; আর তাঁর এই মত বিদেশেরও নৃতত্ত্ববিৎ কেউ-কেউ গ্রহণও ক'রেছেন। কিন্তু এই মত সকলের মনঃপূত হয় না। আমার মনে হয়—আর এ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কারো-কারো মতও আমার অনুকূল—যে এই [৩]-শ্রেণীর লোকেরা নবাগত আর্য্য অথবা মোঙ্গোলদের ভাষা ব'লত না।—সম্ভবতো তারা দ্রাবিড় বা কোল ভাষা ব'লত; কিম্বা অধুনা লুপ্ত অন্য কোনও অনার্য্য ভাষা ব'লত। গঙ্গা ব'য়ে আর্য্য আর গাঙ্গেয় সভ্যতা ঐতিহাসিক যুগে (অর্থাৎ যে যুগের খবর মানুষের লেখা বইয়ে আমরা পাই সেই যুগে) গঠিত আর পুষ্ট হ'য়েছিল;—আর্য্যভাষা, উত্তর-ভারত অর্থাৎ এখনকার সংযুক্ত-প্রদেশ আর বিহার থেকে আগত বিশুদ্ধ বা মিশ্র [১] শ্রেণীর ঔপনিবেশিকের মুখে বাঙলাদেশে প্রসৃত হবার পূর্ব্বে, বাঙলাদেশে [২], [৩] আর [৪]-শ্রেণীর যে অধিবাসীরা বাস ক'রত, তারা যে আর্য্য-ভাষী ছিল না, এ কথা ব'ললে অলৌকিক কথা বলা হয় না। বাঙলার অধিবাসীদের মূল উৎপত্তি

দেশে নানা দ্রাবিড়- আর কোল-জাতীয় লোকের বাস ছিল, তাদের নিজ নিজ ভাষা, ধর্ম, আচার ব্যবহার, সভ্যতা, কৃষ্টি-রীতি, সবই ছিল। অবশ্য, মৌর্য বিজয়ের আগে থেকেই, সুসভ্য, সমৃদ্ধ, আর্য-ভাষী প্রতিবেশী মগধের আর্য-ভাষার প্রভাব বাঙলার অনার্যদের উপর অল্প অল্প এসে প'ড়তে পারে; কিন্তু দেশের জনসাধারণের কথা দূরে থাক্, অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেও আর্য-ভাষা অত' আগে অর্থাৎ মৌর্যদের আগে গৃহীত হ'য়েছিল কিনা জানা যায় না। এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে, তা হ'লে বঙ্গদেশের সিংহবাহু রাজার ছেলে বিজয় সিংহ কি ক'রে 'হেলায় লঙ্কা ক'রল জয়'? বিজয়সিংহের সঙ্গীদের বংশধরেরাই তো সিংহলী ভাষা বলে, আর সিংহলী হ'চ্ছে আর্য-ভাষা; তা হ'লে, বিজয়সিংহ যদি বাঙলা দেশ থেকে গিয়ে থাকেন, তাঁরা বাঙলাদেশ থেকেই তো আর্য-ভাষা নিয়ে গিয়েছিল? বিজয়সিংহ বাঙলা দেশ থেকে গিয়ে থাকলে, মৌর্য যুগের আগে থেকেই এ দেশে আর্য-ভাষার অস্তিত্ব প্রমাণিত হ'য়ে যায় বটে। কিন্তু বিজয়সিংহ বাঙলার লোক ছিলেন না, এ কথা শুনে অনেক বাঙালী চ'টে যাবেন, বা দুঃখিত হবেন। কিন্তু 'দীপবংস' আর 'মহাবংস' ব'লে পালি ভাষায় লেখা সিংহলের যে দুখানি প্রাচীন ইতিহাসে আমরা বিজয়সিংহের কথা পড়ি, সে দুটী আলোচনা ক'রলে, বিজয়সিংহ যে গুজরাটের লোক ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। পালি বই অনুসারে বিজয়সিংহ হ'চ্ছেন 'লাল' (লাড়) বা 'লাড' দেশের রাজার ছেলে; এই 'লাল' (লাড়), বাঙলার 'রাঢ়' বা 'লাঢ়' নয়—এ হ'চ্ছে গুজরাট, যার এক প্রাচীন নাম ছিল 'লাট' বা 'লাড়'। 'দীপবংস' আর 'মহাবংস'-র মতে বিজয়সিংহ লঙ্কায় যাবার সময়ে 'ভরুকচ্ছ' আর 'সুপ্পারক' বন্দর দুটী ছুঁয়ে যাচ্ছেন, এই দুই বন্দর এখনও গুজরাট-অঞ্চলে বিদ্যমান, এদের এখনকার নাম হ'চ্ছে 'ভরোচ' আর 'সোপারা'। আর সিংহলী ভাষা অনুশীলন ক'রে জরমান বিদ্বান্ [illegible] গাইগার সাহেব দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম ভারতের প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে এর যোগ আছে, মাগধী ভাষার সঙ্গে নয়—সিংহলীর সঙ্গে গুজরাট আর মহারাষ্ট্র-অঞ্চলের ভাষার যে রকম যোগ আছে, সে রকম যোগ বাঙলার সঙ্গে যে নেই,

তার সম্বন্ধে আমি একটী প্রমাণ পেয়েছি। আধুনিক ভারতীয় আর্য্য আর দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে 'প্রতিধ্বনি' বা 'অনুকার' শব্দের রীতি আছে। কোনও শব্দের দ্বারা প্রকাশিত ভাবের অনুরূপ বা সংশ্লিষ্ট ভাব প্রকাশ ক'র্‌তে হ'লে, আধুনিক আর্য্য আর দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে সেই শব্দটীকে আংশিকভাবে দ্বিত্ব ক'রে বলা হয়, তবে আদ্য ধ্বনিটীর বদলে অন্য একটী ধ্বনি বসিয়ে বলা হয়। যেমন—বাঙলায় 'ঘোড়া টোড়া', মৈথিলীতে 'ঘোড়া তোড়া', হিন্দীতে 'ঘোড়া উড়া', গুজরাটীতে 'ঘোড়া বোড়া', মারহাট্টীতে 'ঘোড়া বিড়া', তামিলে 'কুতিরৈ কিতিরৈ' ইত্যাদি। দেখা যায় যে, বাঙলা ভাষায় (অন্যান্য পশ্চিম-বঙ্গের ভাষায়) মূল ধ্বনিটীর স্থানে ব্যবহৃত নোতুন ধ্বনিটী হচ্ছে 'ট', মৈথিলীতে 'ত', হিন্দীতে 'উ', গুজরাটীতে 'ব', মারহাট্টীতে 'বি', আর দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে 'কি' বা 'ক' বা 'গ'। আবার এদিকে সিংহলীতে দেখা যায় যে, এইরূপ স্থলে 'ব' ব্যবহৃত হয়, গুজরাটী মারহাট্টীর মতন,—বাঙলার মতন 'ট' বা মৈথিলীর মতন 'ত' অথবা হিন্দীর মতন 'উ' নয়; যেমন সিংহলী 'অশ্বয় বশ্বয়'—বাঙলা 'অশ্ব টশ্ব'; সিংহলী 'দৎ বৎ'—বাঙলা 'দাঁত টাঁত', কিন্তু গুজরাটী 'দাঁত-বাঁত', মারহাট্টী 'দাঁত বিত'। এই বিষয়ে সিংহলীর সঙ্গে পশ্চিম ভারতের ভাষার আশ্চর্য্য মিল দেখা যাচ্ছে,—এই মিল হচ্ছে এদের মৌলিক যোগের ফল, এইরূপ অনুমান করা চলে, অন্য ভাষার প্রভাবের কথা আমরা কল্পনা ক'র্‌তে পারি না। বিজয়সিংহের দল, অর্থাৎ সিংহলের প্রথম আর্য্যভাষী উপনিবেশিকেরা, লাড়, অর্থাৎ লাড, লাট বা গুজরাট থেকেই গিয়েছিল, বাঙলা থেকে নয়; অনুকারধ্বনিতে 'ব' ব্যবহার করে এমন পশ্চিম-ভারতের প্রাকৃত ভাষাই তারা মাতৃভাষা হিসেবে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।

এ ছাড়া, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমে চীনা পরিব্রাজক Hiuen Thsang হিউএন্-ৎসাঙ্ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে আর্য্যদের সিংহল জয়ের কথা ব'লে গিয়েছেন, তাঁর শোনা কিংবদন্তী কিন্তু পালি বইয়ের কিংবদন্তীর সঙ্গে মেলে না—তাঁর শোনা কথা-মত, প্রথম ভারতীয় উপনিবেশিকেরা দক্ষিণ-ভারতের কোনও স্থানের লোক। কাজেই, বিজয় যখন বাঙলারই লোক ন'ন, তখন তাঁর

নয়,—মোটে দু' হাজার, দেড় হাজার বছরের হ'লই বা? কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎকে আরও গৌরবময় ক'রে তুলতে হবে, এই বোধ যেন আমাদের থাকে, আর তা' যেন আমাদেরকে আমাদের জাতীয় আর ব্যক্তিগত জীবনে শক্তি দেয়।

[এই প্রবন্ধ ছাপাবার সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-বিদ্যার ভূতপূর্ব অধ্যাপক, অধুনা ভারত সরকারের প্রাণিতত্ত্ববিদ্যা-বিষয়ক গবেষণাবিভাগের অন্যতম কর্মচারী বন্ধুবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহের সঙ্গে বাঙলার নৃতত্ত্ব-সম্বন্ধে আলাপের সুযোগ হয়, তাতে দু'একটা বিষয়ে নূতন তথ্য তাঁর নিকট পাই, আর তাঁর সমালোচনায় আমি বিশেষ উপকৃত হই। বন্ধুবরের কাছে সেই জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।]

বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন

[বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ১৩২৪ সালের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত (৩১ আষাঢ়, ১৩২৪)]

বাঙ্গালা ভাষার গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন করা, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি তথা বঙ্গভাষা-ভাষী জাতির পত্তনের ইতিহাস আলোচনার জন্য একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য।

আমাদের আধুনিক আর্য্য-ভাষাগুলির সৃষ্টিতে নিম্ন-বর্ণিত কয় প্রকারের উপাদান আসিয়াছে।

প্রথমতঃ, **তদ্ভব** বা **প্রাকৃতজ** শব্দ। মুখ্যতঃ এই শব্দগুলিকে লইয়াই আমাদের ভাষা, এগুলিকে বাদ দিলে কোনও আধুনিক আর্য্য-ভাষার স্বকীয় বলিতে কিছুই থাকে না। প্রাচীনতম আর্য্যযুগে শব্দগুলি যেরূপ প্রচলিত ছিল, মুখে মুখে এক বংশপীঠিকা হইতে আর এক বংশপীঠিকায় ভাষাস্রোতে যখন বাহিত হইয়া আসিতেছিল, এবং নানা অনার্য্য জাতির মধ্যে এই আর্য্য-ভাষা যখন প্রচারিত হইতেছিল, তখন এই শব্দগুলির আর অবিকৃত থাকিতেছিল না, পুরুষ-পরম্পরা ধরিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া, ভাষার ইতিহাসের গতি বা ধারার সঙ্গে যোগ রাখিয়া, শব্দগুলি এখন যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে সেইগুলিকেই আধুনিক আর্য্যভাষার নিজস্ব 'তদ্ভব' বা 'প্রাকৃতজ' শব্দ বলা যায়। আধুনিক আর্য্যভাষার বিভক্তি-প্রত্যয়গুলিরও উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছিল।

তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দের পরে ধরিতে হয় দ্বিতীয়তঃ—**তৎসম** শব্দ, **তৎ-সম** অর্থাৎ-কিনা সংস্কৃত-সম শব্দ। কথ্য বা মৌখিক ভাষাকে বহতা নদীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রাচীন আর্য্য-ভাষার বহতা নদী, লোক-মুখে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতে শুরু করিল। পণ্ডিতজন দেখিলেন যে, প্রাচীন আর্য্য বা বৈদিক অথবা ছান্দস ভাষা আর ঠিক থাকিতেছে না, শিষ্টজনের

মধ্যে ব্যবহৃত প্রাচীন-পন্থী ভাষাও কেহ আর বলে না। ভাষার গতি-নিরোধ বা সংযমন অসম্ভব। তখন তাঁহারা মৌখিক ভাষাকে ত্যাগ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার চর্চায় ও তাহার রক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন, তাহার ব্যাকরণ লিখিলেন। এই শিষ্ট ও সাহিত্যের ভাষা 'সংস্কৃত' নামে খ্যাত হইল। মৌখিক ভাষার গতি যে দিকেই যাউক না কেন, তাঁহারা সংস্কৃতেরই চর্চা করিতে লাগিলেন, ইহাতে বই লিখিতে লাগিলেন, এবং এইরূপে পুরুষের পর পুরুষ ধরিয়া পণ্ডিতের আলোচনার ও রচনার মধ্য দিয়া সংস্কৃত ভাষারও গতি চলিল। মৌখিক ভাষা বহতা নদী, সংস্কৃত তাহার পাশে যেন কাটা খাল, ব্যাকরণের দুই উঁচু পাড় অতিক্রম করিয়া চলে না। আদি যুগের যে-সমস্ত আর্য্য শব্দ বিকৃত হইয়া ভাষায় আসিয়াছে, সেগুলির অবিকৃত মূল-রূপ সংস্কৃতেই রক্ষিত হইয়া আছে। আবশ্যক হইলে, কথিত ভাষার পার্শ্বেই বিদ্যমান সংস্কৃত হইতে শব্দাবলী, ইচ্ছামত এই কথিত ভাষায় গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। এই সব শব্দকে আধুনিক ভাষায় 'তৎসম' শব্দ বলা হয়।

আবার বহু স্থলে এইরূপ ঘটিয়াছে যে, ভাষায় আগত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ তাহার বিশুদ্ধ রূপটী অব্যাহত রাখিতে পারে নাই, লোক-মুখে তাহারও বিকার ঘটিয়াছে। এই বিকারের ফলে তৎসম শব্দের একটী নূতন রূপ দাঁড়াইল, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপ বিকৃত তৎসম শব্দের একটী সংজ্ঞা দিয়াছেন — **ভগ্ন তৎসম** বা **অর্ধ তৎসম** (semi-tatsama)। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, ভাষার গতি-পথ অবলম্বন করিয়া, মূল শব্দের রূপ পরিবর্তিত হইয়া যে ভাবে তদ্ভব বা প্রাকৃত-জ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, দেখা যাইতেছে যে অর্ধ-তৎসমের উৎপত্তি সে ভাবে হয় নাই। আবার এমনটাও হইয়াছে যে মৌখিক ভাষার ইতিহাসে একাধিকবার একই সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হইয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের উচ্চারণ-রীতির দ্বারা অভিভূত হইয়া ঐ একটী শব্দই একাধিক অর্ধ-তৎসম রূপ ধারণ করিয়াছে। এই প্রকারের তদ্ভব বা প্রাকৃত-জ, তৎসম, এবং নানা যুগে উদ্ভূত অর্ধ-তৎসম শব্দের উদাহরণ, এক

গাউক খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ এ, 'কৃষ্ণ' শব্দ অবিকৃত অবস্থায় 'কৃ-ষ্-ণ' (অর্থাৎ 'ক্র্-ষ্-ণ' , রূপে ভারতবর্ষে আর্য্যভাষিগণ-কর্তৃক উচ্চারিত হইত। কিন্তু এই অবিকৃত রূপের বিশুদ্ধি আর রহিল না, তাহার পরিবর্তন আরম্ভ হইল — '*কর্-ষ্-ণ' '*ক-ষ্-ণ' প্রভৃতি রূপের মধ্য দিয়া '*ক-হ্-ণ', এবং অবশেষে খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্য-ভাগে 'কণ্হ' রূপ ধারণ করিয়া বসিল। তখন শব্দটীকে আর 'আদি-যুগের আর্য্য' শব্দ বলা চলিল না, ভাষা তখন 'মধ্য যুগের আর্য্য' বা প্রাকৃত অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছে। ভাষাগত তাবৎ শব্দ যেখানেই এই প্রকার পরিবর্তন সহ, সেখানেই এইরূপে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে এই 'কৃষ্ণ' > 'কণ্হ' শব্দ, প্রাকৃত যুগের অবসানে আধুনিক আর্য্য-ভাষার যুগে, খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকের শেষে, 'কান্হ', ও পরে 'কান' আকার ধারণ করিয়াছে তিন হাজার বছরে এইরূপে 'কৃষ্ণ' শব্দের পরিণতি, এবং 'কান্হ' শব্দে আদরে '-উ' প্রত্যয়-যোগে 'কান্হু' > 'কানু'রূপ এখনও বাঙ্গালা ভাষায় জীবন্ত শব্দ। ওদিকে 'কৃষ্ণ' শব্দ বিশুদ্ধ মূর্তিতে সংস্কৃত ভাষায় বিদ্যমান রহিয়াছে। বিকৃত 'কণ্হ' রূপের পার্শ্বে, প্রাকৃত যুগে কথা ভাষায় নূতন করিয়া 'কৃষ্ণ' শব্দ গৃহীত হইল। কিন্তু প্রাকৃত-ভাষী জনসাধারণের মুখে এই শব্দ '*কর্ষ্ণ', '*ক্রশণ', '*ক্রসণ' প্রভৃতি রূপের মধ্য দিয়া অবশেষে প্রাকৃতে 'কসণ' রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাকৃতের পক্ষে, অতএব 'কণ্হ' হইল তদ্ভব রূপ, 'কসণ' হইল প্রাকৃতে আগত অর্ধ-তৎসম রূপ। পরে যখন বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইল, তখন প্রাচীন বাঙ্গালায় আমরা 'কান্হ' শব্দ পাই—তদ্ভব বা প্রাকৃতজ অর্থাৎ প্রাকৃতের নিকট হইতে লব্ধ রূপ হিসাবে, এবং প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত অর্ধ-তৎসম শব্দ হিসাবে পাই 'কসণ' ('কসণ ঘন গাজই' = 'কৃষ্ণ ঘন অর্থাৎ মেঘ গাজে অর্থাৎ গর্জন করে বা গর্জে', প্রাচীন বাঙ্গালা চর্যাপদ ১৬) তৎসম 'কৃষ্ণ' শব্দ তো ছিল-ই। এই 'কসণ' শব্দ পরে বাঙ্গালায় অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দ আবার নূতন উচ্চারণ-বিপর্যয়ে, মধ্য যুগের বাঙ্গালায় একটী নবীন অর্ধ-তৎসম রূপ গ্রহণ করিয়া বসে—'*ক্রেষ্ণ', 'ক্রেষ্টু।' প্রভৃতি মধ্য-যুগের বাঙ্গালাদেশে বিদ্যমান

সংস্কৃত-ভাষার উচ্চারণ-রীতির অনুমোদিত রূপের সরলীকরণের ফলে শেষে 'কেষ্ট' (='কেশ্‌টো') রূপ আসিয়া গিয়াছে। ও-দিকে হিন্দীতে তদ্ভব রূপ 'কান্‌হ', 'কন্‌হৈয়া (=কানহৈয়া') বিদ্যমান আছে, তাহার পার্শ্বে আবার নবীন হিন্দী অর্ধ-তৎসম রূপের সৃষ্টি হইল 'কিসন, কিসেন'; শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের বা প্রতিমূর্তির নাম হিসাবে, মথুরা বৃন্দাবন অঞ্চল হইতে হিন্দীর এই অর্ধ-তৎসম শব্দ আবার বাঙ্গালায় আসিয়া গেল—'কিষেণ', 'কিষণ' রূপে। অতএব ভারতের আদি-আর্য্য ভাষার 'কৃষ্ণ' শব্দ, তাহার দৌহিত্রী-স্থানীয়া বাঙ্গালা ভাষায় এই মূর্তিগুলি পরিগ্রহ করিয়াছে,—

১। 'কান'—খাঁটী বাঙ্গালা তদ্ভব বা প্রাকৃত-জ শব্দ। আদরার্থক '-উ' ও '-আই' প্রত্যয় যোগে, প্রসারে 'কানু' ও 'কানাই'।

২। 'কসন' প্রাচীন বাঙ্গালার প্রাকৃত হইতে লব্ধ অর্ধ-তৎসম শব্দ; অধুনা লুপ্ত।

৩। 'কেষ্ট' মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দের উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট অর্ধ তৎসম শব্দ। (হিন্দুস্থানীর মুখে, মাড়োয়ারীর মুখে এই শব্দ কচিৎ 'কিষ্টো' বা 'কিস্‌টে' রূপে উচ্চারিত হয়।)

৪। 'কিষণ', 'কিষেণ' হিন্দী হইতে উদ্ধারিত; হিন্দীর নিজস্ব অর্ধ-তৎসম শব্দ 'কিসন্‌' বা 'কিসেন্‌'-এর বাঙ্গালা বিকার।

৫। 'কৃষ্ণ'—তৎসম শব্দ—উচ্চারণে যাহাই হউক, বানানে এটী বিশুদ্ধ সংস্কৃত রূপ অবিকৃত রাখিয়াছে। (বাঙ্গালা দেশে ইহার উচ্চারণ 'ক্রিশ্‌টো' বা 'ক্রিশ্‌নো'; উৎকলে 'ক্রুশ্‌ণ', হিন্দুস্থানে 'ক্রিশ্‌ন্‌' বা 'ক্রিশ্‌ণ'।)

(১) তদ্ভব বা প্রাকৃত-জ, (২) তৎসম, এবং (২ক) অর্ধ-তৎসম—এই তিন জাতীয় শব্দ লইয়া ভারতবর্ষের আধুনিক আর্য্যভাষা-গত আর্য্য উপাদান; দেখা যাইতেছে, এই উপাদান, হয় রিক্থ-রূপে আদি আর্য্য-যুগের মৌখিক ভাষা হইতে প্রাপ্ত ('তদ্ভব' বা 'প্রাকৃত-জ' শব্দাবলী), নয় প্রাচীন ও মধ্য যুগের সাহিত্য, শিক্ষা ও ধর্মের ভাষা সংস্কৃত হইতে ঋণ-স্বরূপে বা দান-স্বরূপে স্বীকৃত ('তৎসম' ও 'অর্ধ-তৎসম' শব্দাবলী)। ভাষাগত তৎসম শব্দাবলীর আলোচনা,

আয়াস সাধ্য ব্যাপার নহে ; সংস্কৃতের সঙ্গে অল্প পরিচয়েই আমরা ইহাদের চয়ন এবং বিশ্লেষণ করিতে পারি। অর্ধ-তৎসম শব্দ লইয়া আলোচনা করা ও তাদৃশ কষ্ট-সাধ্য নহে ; কারণ, ইহাদের সংস্কৃত মূলের সহিত সাদৃশ্য বিশেষরূপে প্রকট হইয়াই আমাদের সমক্ষে বিদ্যমান। তদ্ভব শব্দ লইয়া অনেক স্থলে গোল নাই, 'কর্ণ > কণ্ণ > কান', 'চন্দ্র > চন্দ > চাঁদ', 'কার্য > কয্য > কজ্জ > কাজ', 'সমর্পয়তি > সমপ্পেদি > সওঁপেই > সঁপে', 'আদিশতি > আদিসদি > আইসই > আইসে > আসে' প্রভৃতি—লইয়া আমাদের বিব্রত হইতে হয় না। আবার বহু স্থলে বহু শতাব্দী ধরিয়া নানা পরিবর্তনের ফেরের মধ্য দিয়া আসার জন্য একটু অনুসন্ধান করিয়া তবে তদ্ভব শব্দের সাধন করিতে হয়। যেমন, 'এও < অইও < আয়া < অইঅ < আইহ < *আইহব < *অইহব < অবিহবা < অবিধবা', 'সকড়ি, সকড়ি < সক্কড়িঅ < সক্কটিকা < সকট- < সং + কৃত' ; '√পর < পহর, পহই < পহির, পহিধ < পরি + √ধা', 'আয়ান < আইহণ < *অহিঅন < *অহিমন্নু < অহিবন্নু < অভিমন্যু', 'দেরকো, দেউরখা < *দিঅউরখ < দিঅরুখা < দীবরুক্খ- < দীপরুক্ষ-', ইত্যাদি। 'আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধুভাষায়, তদ্ভব বা প্রাকৃত-জ, ও অর্ধ-তৎসম শব্দ শত-করা ৫১টার উপর, বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ শত-করা ৪৪টা, আর বিদেশী শব্দ (ফারসী, পোর্তুগীস, ইংরেজী) শত-করা ৪টার কিছু বেশী। কলিকাতা অঞ্চলের হিন্দু ভদ্রগৃহের মৌখিক চলিত ভাষায় কিন্তু তৎসম শব্দের সংখ্যা অনেক কম, শত-করা ১৭ ; বিদেশী শব্দ শত-করা ৩, এবং বাকী শত-করা ৮০টা তদ্ভব বা প্রাকৃত-জ, অর্ধ-তৎসম এবং অজ্ঞাত-মূল শব্দ লইয়া।'

বাঙ্গালার বিদেশী শব্দ লইয়াও বেশী ঝঞ্ঝাট নাই, সহজেই বা অল্প আয়াসেই তাহাদের মূল ফারসী বা ইংরেজী বা পোর্তুগীস শব্দটির সহিত তাহাদের যোগ-সূত্র বাহির করিতে পারা যায়। বাঙ্গালায় তদ্ভব বা প্রাকৃতজ, তৎসম ও অর্ধ-তৎসম এবং বিদেশী শব্দ ব্যতীত আর এক শ্রেণীর শব্দ আছে ; সেগুলির মূল নির্ধারণ করা বড়ই কঠিন, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় যেমন অধিক, প্রয়োগেও তেমনি সুপরিচিত ও সাধারণ। প্রাচীন ভারতের প্রাকৃত বৈয়াকরণেরা এইরূপ

শব্দ কিছু-কিছু প্রাকৃতেও লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং ইহাদের নাম দিয়াছেন দেশী। তাঁহাদের ব্যবহৃত এই সংজ্ঞা আমরা বাঙ্গালায় ও অন্যান্য আধুনিক আর্য্য-ভাষায় প্রাপ্ত ঐ জাতীয় শব্দ-সম্বন্ধে ব্যবহার করিতে পারি।

প্রথম, অনুকার শব্দগুলিকে দেশী পর্য্যায়ে ধরা হয়—'চট্, সাঁ, টক্‌টক্, থরথর, ছট্‌ফট্, হিজিবিজি' ইত্যাদি। কিন্তু অনুকার শব্দ ছাড়া অন্য পদার্থ- বা ভাব- বা ক্রিয়া-বাচক বহু শব্দ আছে, যেগুলি বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টির পরে বাঙ্গালায় কোনও বিদেশী ভাষা হইতে আইসে নাই, এবং যেগুলি রিক্থ-হিসাবেই প্রাকৃতের নিকট হইতে বাঙ্গালা ভাষা পাইয়াছে,— এবং সংস্কৃতের বা আর্য্য-ভাষার ধাতু-প্রত্যয় দ্বারা যাহার কোনও ব্যাখ্যা হয় না। যেমন— '√ এড়্, √ নড়্, টপক, পাড়া ও কাড়া (=মহিষ), ঘোমটা, খেঁচ (=কড়ি), গাড়ী, খুড়ী, ঝাড়, ঝাঁট, ঢিল, ঝাণ্ডা, ঝাঁপ, ঝোপ, টোপর, ছাল, চোঙ্গা, √ চাট, চোপ, পেট, কামড়, থোড়, বইচি, ডাগর, চটা, ঢেউ, ডেকরা, ডাহা, ডাঁসা, ডাব, ডিঙ্গা, ডিঙ্গানো, ডোকলা, ঝাড্ডা, গোড়া' প্রভৃতি। এইরূপ কতকগুলি শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্কৃতে মিলিলেও, তাদৃশ সংস্কৃত শব্দের ব্যাখ্যা-ও ভালো করিয়া করা যায় না। যেমন—'লাড়ু, খাড়ু' = সংস্কৃত 'লড্ডুক, খড্ডুক', 'তেঁতুল', প্রাচীন বাঙ্গালা 'তেন্তলী' = সংস্কৃত 'তিন্তিড়ী', 'হাঁড়ী' = 'হড্ডিক' ইত্যাদি। বাঙ্গালা সাধু ভাষা পারত-পক্ষে এইরূপ শব্দ বর্জন করিয়া থাকে, কিন্তু চলিত ভাষায় এইরূপ শব্দ শত শত মিলে। ইহাদের সংস্কৃত প্রতিরূপ পাইলেও, ইহাদের পূর্ণ সমাধান বিষয়ে আমরা 'হা'লে পানি পাই না'।

এই সব শব্দের অনেকগুলি প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় আগত; সেজন্য সেগুলিকেও প্রাকৃত-জ বলা যায়। কিন্তু মূলতঃ এগুলি আর্য্য ভাষার শব্দ নহে; এই জন্য, কেবল প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত তদ্ভব আর্য্য-শব্দাবলীকে 'প্রাকৃত-জ' বলিয়া, এগুলিকে 'দেশী' পর্য্যায়ে আলাহিদা ফেলিতে পারা যায়।

বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ শিখিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় আগত সকল রকম শব্দের সাধন ও ব্যবহার শিখিতে হইবে। ভাষা শিক্ষার উপযোগী বাঙ্গালা ব্যাকরণে ভাষা-গত তদ্ভব বা প্রাকৃত-জ, তৎসম, অর্ধ-তৎসম, দেশী এবং বিদেশী

সর্বপ্রকার শব্দ-সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লইবার চেষ্টা থাকা উচিত। দেশী, বিদেশী এবং প্রাকৃত-জ ও অর্ধ-তৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমরা কিন্তু বেশী অবহিত হই না; familiarity breeds contempt। এগুলির যেমন-তেমন বানান হইলেই হইল। (কেবল ভাষায় আগত ইংরেজী শব্দগুলি বাদে—অন্যথা ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞতা-রূপ মহাদোষে ধরা পড়িবার ভয় আছে।)। এগুলির যথাযথ প্রয়োগ-সম্বন্ধে আমরা কোনও শিক্ষা পাই না, বা দেই না, —এ বিষয়ে আমরা আমাদের সহজ ভাষা-জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকি। কিন্তু এক অঞ্চলে ব্যবহৃত প্রাকৃতজ, অর্ধ-তৎসম ও দেশী শব্দ—অন্য অঞ্চলের সেই সেই পর্যায়ের শব্দাবলী হইতে রূপে, অর্থে ও প্রয়োগে যথেষ্ট পার্থক্য রক্ষা করে। (বিদেশী শব্দ সংখ্যায় অল্প, এগুলি নূতন আগত, এগুলির অপপ্রয়োগ বা অর্থ-পার্থক্য তেমন ঘটে নাই।)। যাঁহারা এক অঞ্চলে জন্মিয়া সেখানকার ভাষাই শিক্ষা করিয়া, অন্য অঞ্চলের কথিত ভাষা ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন, যে ভাষার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই সেই ভাষা প্রয়োগ করিতে তাঁহারা অনেক সময়ে, শিক্ষা অথবা অভিনিবেশের অভাবে, যথার্থ রূপে সমর্থ হন না। ভালোর জন্যই হউক বা মন্দের জন্যই হউক, উচিতই হউক বা অনুচিতই হউক, ভাগীরথী নদীর সংলগ্ন স্থানের, বিশেষ করিয়া কলিকাতা-অঞ্চলের, ভদ্র-সমাজের কথ্য ভাষা আজকাল সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে; এমন কি, সাধু-ভাষার স্থানও এই ভাষা দখল করিতে চাহিতেছে। এই ভাষা মূলতঃ অঞ্চল-বিশেষের মৌখিক ভাষা; ইহার ব্যাকরণ ও উচ্চারণ-রীতি সমগ্র বাঙ্গালার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যবহারিক ভাবে স্বীকার করিয়া লইলেও, নিজ মাতৃভাষা-গত বিকল্প-হিসাবে সমগ্র বঙ্গদেশের সমস্ত শিক্ষিত-মণ্ডলী ইহার বিশেষত্ব, ইহার তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম এবং দেশী শব্দগুলির অধিকারী হইতে পারেন নাই। সেইজন্য অবিসংবাদিতার্থ সংস্কৃত শব্দাবলীতে পূর্ণ প্রশস্ত রাজমার্গস্বরূপ সাধু ভাষা ত্যাগ করিয়া, যাঁহারা কলিকাতা-অঞ্চলের চলিত ভাষার পথে চলিতে চাহেন, অচেনা পথে চলার জন্য তাঁহাদের অনেকে অনেক সময়ে যে বিভ্রাট ঘটাইয়া বসেন, তাহা তাঁহাদের এবং পাঠকদের উভয়েরই

পক্ষে কষ্টকর। আজকালকার কোনও কোনও বাঙ্গালা দৈনিক, সাপ্তাহিক অথবা মাসিক পত্রের বহু লেখকের লেখা দেখিলেই এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, সাহিত্যে কলিকাতা-অঞ্চলের মৌখিক ভাষার প্রতিষ্ঠার ফলে, ঐ ভাষার তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম ও দেশী শব্দগুলির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ-রীতির প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গদ্যের সাধু-ভাষাই আদর্শ থাকায়, এতাবৎ খাঁটি বাঙ্গালাকে সাধু ভাষার আওতায়, পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া, সাধু-ভাষার বিশেষত্ব সংস্কৃত শব্দই বাঙ্গালী ছাত্রের মাতৃভাষার ব্যাকরণের মুখ্য উপজীব্য হইয়া আছে— তাহার সন্ধি-বিচ্ছেদ, স্বত্ব-ণত্ব-বিধান, কৃৎ-তদ্ধিত, সমাস প্রভৃতিই ছিল ভাষা জ্ঞানের একমাত্র পথ—বিশুদ্ধ বাঙ্গালার সন্ধি, উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য-সমেত প্রত্যয়ের কাজ, কৃৎ-তদ্ধিত, সমাস, অনুকার-শব্দ, সহায়ক ক্রিয়া প্রভৃতি আলোচনার আবশ্যকতা এখনও উপলব্ধ হয় না। কারণ, খাঁটি বাঙ্গালার যেটুকু আমাদের গদ্যের সাধু-ভাষায় ব্যবহৃত হয়, সেইটুকুর পক্ষে, মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সহজ ভাষা-জ্ঞান আমরা পাইয়া থাকি, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বইয়ের ভাষার বাকী কথা শিখিবার জন্য ব্যাকরণের নিকট উপদেশ লওয়া হয়।

যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ-শিক্ষার জন্য ভাষার সকল রকমের উপাদানের চর্চা আবশ্যক হইলেও, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় আমাদের সর্বাপেক্ষা সমস্যাময় উপাদান হইতেছে, তদ্ভব ও দেশী উপাদান। একটা বড় বিষয়ে তদ্ভব (বা সঙ্কুচিত অর্থে 'প্রাকৃত-জ') উপাদানের (শব্দ ও প্রত্যয়াদির) আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আছে—সেটী সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অস্তিত্ব। দেশী শব্দের সম্বন্ধে সেরূপ কিছুই সুবিধা নাই, কচিৎ দুই-চারিটী অনুরূপ প্রাকৃত শব্দ মেলে—যেমন, বাঙ্গালা 'চাঙ্গা'—প্রাকৃত 'চঙ্গ' = ভালো, বাঙ্গালা 'পেট'—প্রাকৃত 'পোট্ট'; মারহাট্টী 'তুপ'—প্রাকৃত 'তুপ্প' = ঘী; বাঙ্গালা 'ছট্‌ফট্‌' = প্রাকৃত 'চডপড', বাঙ্গালা 'চাটা' = প্রাকৃত 'চট্ট', ইত্যাদি। সংস্কৃতেও যদি দেশী শব্দের অনুরূপ শব্দ পাওয়া যায়, তাহা হইলেও খুব বিশেষ সাহায্য হইল না; কারণ অনেক স্থলে শব্দটী বা ধাতুটীর বাহ্য রূপ দর্শনেই

শব্দ ধরনের হইয়া গেল, অনার্য ভাষার বহু শব্দের ধাতু নিয়া আর্য্য-ভাষার ধাতু- ও শব্দ রূপ গ্রহণ করিয়া চলিল। এই অবস্থায়, আর্য্য ভাষা গ্রহণ করিয়াছে এমন আর্য্যীকৃত অনার্য্যদের মধ্যে অনার্য্য ভাষার শব্দ যে কিছু কিছু রহিয়া যাইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে, এবং অনুমান হয়, হইয়াছিলও তাহাই। বিশেষ ভাষা জ্ঞান ও দক্ষতার সহিত এই বিষয়ে অনুসন্ধান চলিতেছে। এতদ্দেশের বৈশিষ্ট্য নানা উদ্ভিদ্ ও জীব-জন্তুর নাম লইয়া, এবং এতদ্দেশের অনার্য্য লোকদের মধ্যে প্রচলিত নানা ব্যবহার, রীতি নীতি ও অনুষ্ঠান লইয়া এই সব শব্দ; এতদ্ভিন্ন সাধারণ প্রাকৃতিক পদার্থ বাচক নামও কিছু কিছু গৃহীত হইয়াছিল।

এই সমস্ত শব্দ দ্বারা ভারতীয় হিন্দু জগতের সৃষ্টিতে অনার্য্য-কর্তৃক আহৃত উপাদানের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। Kittel কিটেল্ কর্তৃক সঙ্কলিত কানাড়ী ভাষার বৃহৎ অভিধানের ভূমিকায় সংস্কৃত-গত, অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণিত অথবা সম্ভাব্য, সার্ধ-ত্রিশত দ্রাবিড়-শব্দের আলোচনা আছে। ইহা হইতে আর্য্য- বা হিন্দু-সভ্যতায় দ্রাবিড়-জগতের সহায়তার প্রসার কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। কোল জগতের নিকট হইতে গৃহীত উপাদানের কথা পশিলুস্কি ও লেভির প্রবন্ধগুলি হইতে পাওয়া যাইবে—এই প্রবন্ধাবলী ফরাসী হইতে ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া আমার সতীর্থ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সকল প্রাকৃত-, আধুনিক আর্য্য-ভাষা- তথা সংস্কৃত গত দেশী ও অনার্য-মূল শব্দের আলোচনার ফলে, ভারতবর্ষের সভ্যতার পত্তন-সম্বন্ধে আমাদের বহুযত্ন-পোষিত অনেক ধারণা একেবারে উল্টাইয়া যাইতেছে। দেখা যাইতেছে যে, অনার্য্য বহু উপাদান, হিন্দু-সভ্যতার গঠনে অনার্য্যের সাহায্য, আর্য্যের আহৃত উপাদান এবং আর্য্যের সাহায্য অপেক্ষা কম নহে, বরঞ্চ অনেক বিষয়ে বিশেষ গভীর, বিশেষভাবে চিরস্থায়ী, বিশেষভাবে মৌলিক। এই বিষয়ের আলোচনা এখন সম্ভব হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। আমাদের ভারতীয় সামাজিক ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানে তাম্বূলের একটা বড় স্থান আছে। পান খাওয়া, পান দিয়া সম্বর্ধনা করা, পূজায় পান দেওয়া—এই সমস্ত, বিশেষ-রূপে

করিবার সুবিধা যাহাদের আছে, সেইরূপ সত্যানুসন্ধিৎসু স্বজাতি বৎসল মাতৃ-ভাষানুরাগী বাঙ্গালী যুবক অক্লেশেই Sir George Abraham Grierson স্যর জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সনের Bihar Peasant Life-এর মত বইকে আদর্শ করিয়া এই শব্দ সংগ্রহ কাজে লাগিয়া যাইতে পারেন। জিজ্ঞাসা বা অভি-নিবেশের সহিত শ্রবণ ও লিখনের দ্বারা তাঁহারা ভারত-বিদ্যার ভাণ্ডারে, কেবল-মাত্র এইরূপ একটী সংগ্রহের সাহায্যে, এমন চিরস্থায়ী আলোচ্য উপাদান দিয়া যাইতে পারিবেন, যাহার মূল্য, যাবৎ এই সমস্ত বিষয়ের চর্চা থাকিবে, তাবৎ সুধীসমাজে সাদরে স্বীকৃত হইবে।

স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি

বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট উচ্চারণ-রীতি আছে, যাহাতে আধুনিক বাঙ্গালার (বিশেষতঃ চলিত ভাষার) রূপ, শব্দধ্বনি বিষয়ে অন্যান্য আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলির শব্দের রূপ হইতে একেবারে ভিন্ন প্রকারের হইয়া গিয়াছে। গত চার পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা শব্দগুলির বিকার বা বিকাশ এই উচ্চারণ-রীতিগুলিকেই অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। সংস্কৃতে এইরূপ বিশেষ রীতি একেবারেই অজ্ঞাত, সুতরাং এতাদৃশ উচ্চারণ রীতির আলোচনা সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ করেন নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণ সাধারণতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণেরই অনুকরণ হইয়া থাকে বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ-রচয়িতারা বাঙ্গালার নিজস্ব এই উচ্চারণ-রীতির ও তদবলম্বনে বর্ণ-বিন্যাস-পদ্ধতির আলোচনা-বিষয়ে মনোযোগী হন নাই। কিন্তু বাঙ্গালা সাধু ভাষা ও চলিত-ভাষার পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার গতি সম্যগ্ভাবে প্রণিধান করিতে হইলে, এবং বাঙ্গালা ভাষায় মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে আগত অর্ধ-তৎসম (অর্থাৎ বিকৃত বা অশুদ্ধরূপে উচ্চারিত ও পরিবর্তিত সংস্কৃত) শব্দগুলির পরিবর্তনের ধারা অনুধাবন করিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষার এই বিশেষ উচ্চারণ-নিয়ম কয়টির সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক। এই-সকল নিয়ম মৎপ্রণীত Origin and Development of the Bengali Language পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৪ ৪০২, এবং অন্যত্র।। বর্তমান প্রবন্ধে সেই সব বিষয়ের বিস্তৃত-ভাবে পুনরবতারণা করিবার উদ্দেশ্য নাই। আলোচিত উচ্চারণ-রীতির মধ্যে কতকগুলির উপযোগী বর্ণনাত্মক নাম বাঙ্গালায় নাই—অন্ততঃ আমি পাই নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের পারিভাষিক শব্দাবলীর মধ্যে এই উচ্চারণ-রীতির নাম নাই, কারণ, সংস্কৃতে এইরূপ রীতির আলোচনা হইবার অবকাশই হয় নাই, এবং

বাঙ্গালী ব্যাকরণকারদিগের মধ্যেও কেহ নূতন নাম সৃষ্টি করিয়াও দেন নাই। ইউরোপের ভাষাতত্ত্ববিদ্যায় কিন্তু এই সকল উচ্চারণ-স্থানের পরিচায়ক সংজ্ঞা ইংরেজী, ফরাসী, জরমান প্রভৃতি ভাষায় নির্ধারিত হইয়া আজকাল সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিতে হইলে এইরূপ সংজ্ঞার আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা বাঙ্গালায় এই উচ্চারণ-স্থানের পরিচায়ক কতকগুলি সংজ্ঞা বা নাম প্রস্তাব করিতেছি। বলা বাহুল্য, প্রস্তাবিত সংজ্ঞা বা নাম বা পারিভাষিক শব্দগুলি নিখিল ভারতে সহজ গ্রহণের উপযোগী করিবার জন্য সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয় হইতে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে—হিন্দী উড়িয়া পাঞ্জাবী গুজরাটী মারাঠী এবং তেলুগু কানাড়ী তামিল মালয়ালম প্রভৃতি ভারতের তাবৎ সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষায় আবশ্যক মত ব্যবহারের যোগ্য। বিদ্যার্থীকে সুবোধ্য করিবার জন্য উপযুক্ত চিত্রের উচ্চারণ রীতিগুলির একটু আলোচনা অপরিহার্য হইবে।

সাধু বা প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দের ধাতুর মূল স্বরধ্বনির নানাবিধ পরিবর্তন দেখা যায়। এই সব পরিবর্তনকে নিম্নলিখিত কয়টী পর্যায়ে বা শ্রেণীতে ফেলা যায়। যথা:—

[১] চলিত ভাষায়, অর্থাৎ ভাগীরথী নদীর উভয় তীরস্থ ভদ্র মৌখিক ভাষায় ও তাহার আদর্শের উপর স্থাপিত নূতন সাহিত্যের ভাষায়, নিম্নে আলোচিত উচ্চারণ-রীতি বিশেষ ভাবে বিদ্যমান। যথা—'দেশী' > 'দিশি'; 'ছোরা', হ্রস্বার্থে 'ছোরী' স্থানে 'ছুরী'; 'ঘোড়া', স্ত্রীলিঙ্গে 'ঘোড়ী' স্থলে 'ঘুড়ী'; 'দে' ধাতু—'আমি দেই' স্থলে 'দিই' বা 'দি', কিন্তু 'সে দেএ' স্থলে 'দেয়' (= দ্যায়); 'শো' ধাতু—'আমি শোই' না হইয়া 'আমি শুই', কিন্তু 'সে শোয়'; 'শুন' ধাতু—'আমি শুনি', কিন্তু 'সে শুনে' স্থলে 'সে শোনে'; 'কর্' ধাতু—'আমি করি' স্থলে 'কোরি', কিন্তু 'সে করে'—এখানে অ-কার ও-কারে পরিবর্তিত হয় নাই; 'বিলাতী' > 'বিলাতি' > 'বিলিতি'; 'উড়ানী' > 'উড়ুনি'; সংস্কৃত 'শেফালিকা' > প্রাকৃত 'সেফালিআ' > অপভ্রংশ 'সেহলিঅ' > বাঙ্গালা 'শিউলি'; ইত্যাদি।

উচ্চারণ এখন আর স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত একাক্ষর শব্দে শ্রুত হয় না : 'চারি' > 'চাইর্' > 'চের্', যথা 'চাইরের পাঁচ' > 'চেরের পাঁচ' = ২০, 'পাঁঠি' > 'পাঁইট্' > 'পেঁট্'—যথা 'মনে মনে পেঁট দিচ্ছে', 'পেঁটের কড়ি', 'সাধু' > 'সাউধ্' > 'সাইধ্'—'সেধ', যথা 'পাঁচ দিন চোরের, একদিন সেধের', 'রাখিয়া' > 'রাইখ্যা' > 'রেখ্যা' > 'রেখে', 'সাথুআ' > 'সাউথুআ' > 'সাইথুআ' > 'সেথো'; 'করিতে' > 'কইর্তে' > 'ক'র্তে' = 'কোর্তে'; 'করিয়া' > 'কইর্যা' > 'ক'র্যা' > 'ক'রে' = 'কোরে', 'হরিয়া' > 'হইর্যা' > 'হ'র্যা' > 'হ'রে' = 'হোরে'; 'জলুআ' > 'জইলুআ' > 'জ'লো' = 'জোলো', 'চক্ষু' > 'চখ্' > 'চউখ্', 'চইখ' > 'চোখ', ইত্যাদি।

চলিত-ভাষার প্রচারে এই ধরণের পরিবর্তনের ফল, বহু রূপ, সাধু-ভাষাতেও আসিয়া গিয়াছে : যথা—'ছালিয়া' > 'ছাইল্যা' > 'ছেলে', 'মাইয়া' > 'মায়্যা' > 'মেয়ে', 'থাকিয়া' > 'থাইক্যা' > 'থেকে', 'জলুয়া' > 'জ'লো'; 'জালিয়া' > 'জেলে'; ইত্যাদি।

[৪] চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন অন্য ধরণের—প্রথম তিন প্রকারের পরিবর্তন সংস্কৃতে অজ্ঞাত, কিন্তু চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন সংস্কৃতে মিলে। যথা—'চল্' ধাতু—'চলে', কিন্তু ণিজন্ত 'চালে' (এই মূল অর্থে ণিজন্তও আছে—'চালায়', 'চলায়')—তুলনীয়, সংস্কৃত 'চলতি'—চালয়তি'; 'পড়' ধাতু পড়ে—'পড়ে', ণিজন্ত 'পাড়ে', 'টুট্' ধাতু—'টুটে', ণিজন্ত 'তোড়ে'। এখানে অবস্থা গতিকে পড়িয়া ধাতুর মূল স্বরধ্বনির স্বরূপেই পরিবর্তন ঘটিয়াছে—'চল্—চাল্', 'পড়্—পাড়্', 'টুট্—তোড়্'

একণে উপর্যুক্ত চারি প্রকারের পরিবর্তন-রীতির অন্তর্নিহিত কারণ বা প্রেরণাটি কি, তাহা বুঝিয়া, বাঙ্গালায় ইহাদের কাহার কি নাম দেওয়া সমীচীন হইবে, তাহার বিচার করা যাউক।

[১] প্রথম প্রকারের পরিবর্তন শব্দ মধ্যস্থিত স্বরবর্ণগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি আনিবার চেষ্টায় ঘটিয়াছে। 'দেশী' > 'দিশি'—এখানে প্রথম অক্ষরের এ-কার, পরবর্তী অক্ষরের ঈ-কারের (ই-কারের) প্রভাবে, পরবর্তী ই ধ্বনির সহিত সঙ্গতি রাখিবার চেষ্টায় নিজেই ই-কারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ঈ (ই)-র উচ্চারণে জিহ্বা মুখবিবরের অগ্রভাগে প্রসৃত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বে উঠে। এ-কারের বেলায়, ঊর্ধ্বে উঠে না, একেবারে নিম্নেও নামে না, মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। বাঙ্গালা উচ্চারণে, পরবর্তী ই-কারের আকর্ষণের ফলে, পূর্ববর্তী এ-কারের উচ্চারণের সময়েই, এ-কারের স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ই-কারের স্থানে জিহ্বা উত্তোলিত হইয়া পড়ে; ফলে, এই এ-কারের সহজেই ই-কারে পরিবর্তন ঘটে। উ-কার এবং ও-কার উচ্চারণে জিহ্বা মুখবিবরের ভিতরের দিকে বা পশ্চাদ্ভাগে আকর্ষিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে অধরোষ্ঠ সঙ্কুচিত হইয়া বৃত্তাকার ধারণ করে; মুখাভ্যন্তরে আকর্ষিত জিহ্বা উ-কারের বেলায় উচ্চে উঠে, ও-কারের বেলায় মধ্যভাগে থাকে, এবং অ-কারের বেলায় নিম্নে অবস্থান করে। 'ঘোড়া' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-প্রত্যয়-জাত 'ঘোড়ী' শব্দের উচ্চারণে, প্রথম অক্ষরের ও-কার পরবর্তী অক্ষরের ঈ-কারের প্রভাবে পড়ে, ইহার দ্বারা আকর্ষিত হয়, এবং ঈ- বা ই-কারের উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান উচ্চে হয় বলিয়া, ও-কারও উচ্চে আনীত হয়; ফলে ইহার উ-কারে পরিবর্তন 'ঘুড়ী'। তদ্রূপ—'করে, করা' পদে, এ-কার জিহ্বার মধ্য-অবস্থান-জাত, আ-কার জিহ্বার অধঃ-অবস্থান-জাত; এই জন্য ইহাদের প্রভাবে বা আকর্ষণে পড়িয়াও অ-কার নিম্নেই থাকে, উচ্চে উঠিয়া নিজ রূপ বদলায় না; কিন্তু 'ক-রি'—'কোরি', এখানে ই-কার উচ্চারণ করিবার সময়ে জিহ্বা উচ্চে উঠে, তাই ইহার আকর্ষণে ক-এর অ-কারও কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়, ও-কারে পরিবর্তিত হয়। তদ্রূপ 'কর্-উক্', 'ক-রুক্'—'কোরুক্'—এখানে ক-এর অ-কার, 'উক্' এর উ-কারের আকর্ষণে উচ্চে উঠিয়া ও-কার হইয়া গিয়াছে।

পর পৃষ্ঠায় (পৃঃ ৭১তে) প্রদত্ত চিত্রধারা স্বরবর্ণ উচ্চারণে মুখের অভ্যন্তরে জিহ্বার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে; এবং এই চিত্রের সাহায্যে, কি করিয়া উচ্চাবস্থিত জিহ্বার দ্বারা উচ্চারিত 'ই, উ'র প্রভাব বা আকর্ষণে এ-কার ই-কার হয়, অ-কার ও-কার হয়, বা ও-কার উ-কার হয়, এবং এই প্রকারের নানা পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বাঙ্গালা শব্দের অভ্যন্তরস্থিত স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা টান বা আকর্ষণ পড়ে। ফলে, উচ্চাবস্থিত স্বর 'ই, উ'-র প্রভাবে, মধ্যাবস্থিত স্বর 'এ, ও' এবং নিম্নাবস্থিত স্বর 'আ, অ'—যথাক্রমে 'ই, উ' এবং 'এ, ও'-তে পরিবর্তিত হয়; এবং মধ্যাবস্থিত স্বর 'এ, অ্যা' তথা 'ও', 'অ'-র প্রভাবে পড়িয়া, উচ্চে আকর্ষিত হইতে পারে না, 'অ'-র প্রভাবহেতু উচ্চাবস্থিত স্বর 'ই, উ' মধ্যস্থানে নামিয়া আসিয়া, যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও' হইয়া যায়। উঁচু নীচুকে উঁচুতে টানে, নীচু উঁচুকে নীচে নামাইয়া দেয়—ইহাই হইতেছে এই প্রভাবের মূল কথা। এই অনুসারে বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের ও অন্যান্য পদের রূপের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

বাঙ্গালা ভাষায় ধাতুতে স্বরধ্বনি

'অ ই উ এ ও' [ɔ, i, u, e, o]

থাকিলে, প্রত্যয় বা বিভক্তিতে যদি 'ই, উ' [i, u] আইসে, তাহা হইলে পূর্বোল্লিখিত ধাতুর স্বরধ্বনি চলিত ভাষায় যথাক্রমে

'ও ই উ এ (ই) উ' [o, i, u, e (i), u]

রূপে অবস্থান করে; এবং

প্রত্যয়ে বা বিভক্তিতে 'এ (বা ই), আ, অ, ও' [e (i), a, ɔ, o] আসিলে, চলিত-ভাষায় ধাতুর স্বর যথাক্রমে

'অ এ ও অ্যা (এ) ও [ɔ, e, o, æ (e), o]

রূপে অবস্থান করে। * যথা—

'চল্' ধাতু—'চল্' + '-অহ' = 'চলহ, চলো'; 'চল্' + '-এ' = চলে', চল্' +

সাধু-বাঙ্গালার ও চলিত-বাঙ্গালার সাতটী স্বর ধ্বনি—অ, আ, ই, উ, এ, 'অ্যা', ও—এগুলির উচ্চারণের সময়ে মুখাভ্যন্তরে জিহ্বার অবস্থান, নিম্নে প্রদত্ত চিত্রে প্রদর্শিত হইল।
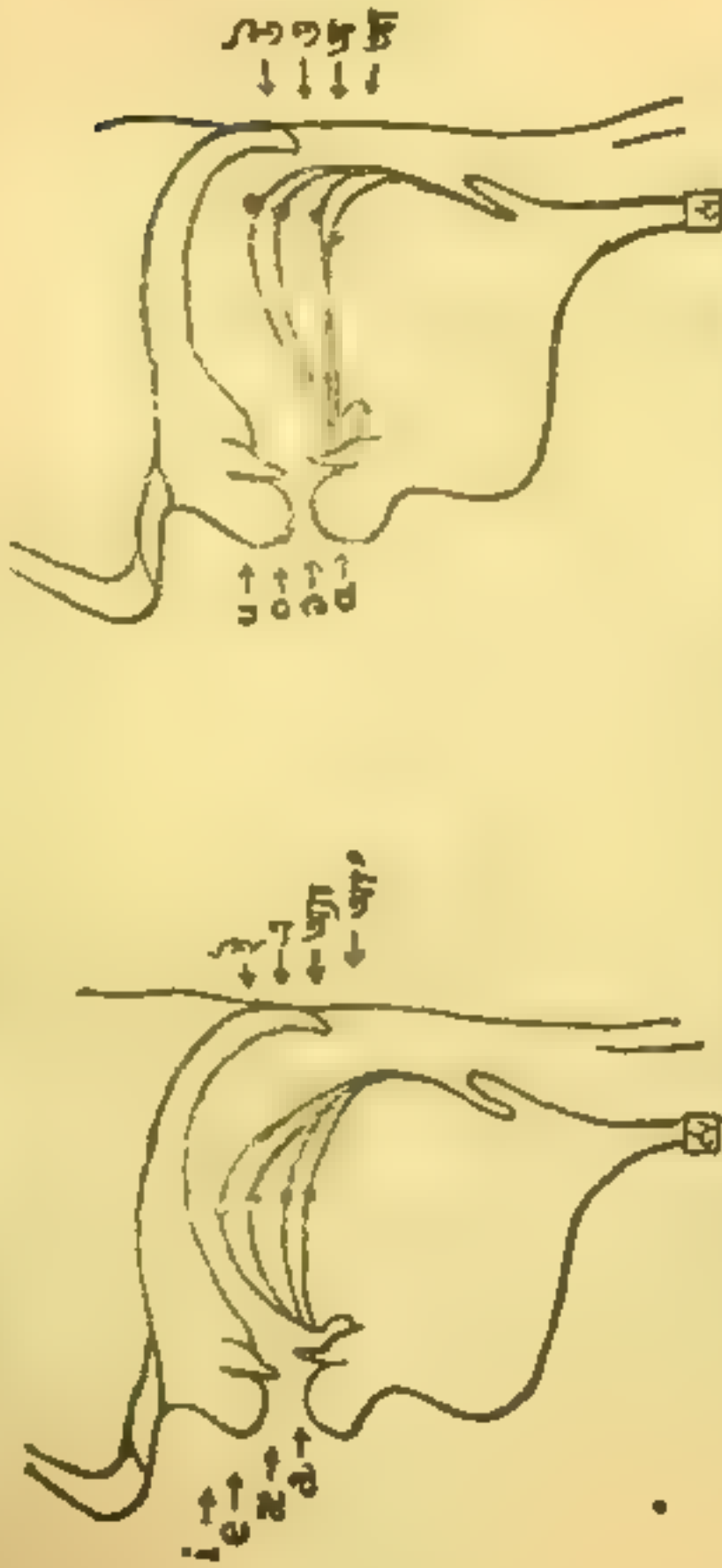
জিহ্বা সম্মুখভাগে দন্তের দিকে প্রসৃত করিয়া উচ্চারিত স্বর-ধ্বনি—
[ই, এ, অ্যা, আ—i e æ a]

জিহ্বা পশ্চাতে কণ্ঠের দিকে আকর্ষিত করিয়া উচ্চারিত স্বর-ধ্বনি—
[আ, অ, ও উ—ɑ, ɔ, o, u]

(উপসর্গ) + in (উপসর্গ) + thesis (শব্দ), thesis-শব্দ আবার ক্রিয়া-বাচক the- ধাতু + sis প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন। epi উপসর্গের অর্থ 'উপরে', 'অধিকন্তু' (upon, in addition to), en-এর অর্থ 'ভিতরে', এবং thesis অর্থে 'স্থাপন', বা 'রক্ষণ'। গ্রীক epi-র প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ হইতেছে 'অপি', 'উপরে' অর্থে 'অপি' উপসর্গের প্রয়োগ হইত, 'নিকটে, সংযোগে, অধিকন্তু, অভ্যন্তরে' এই সকল অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হইত, 'অধিকন্তু'—এই অর্থে এই উপসর্গের অব্যয় রূপে ব্যবহারও আছে, বৈদিক সংস্কৃতে 'ধা' ধাতুর সঙ্গে 'অপি' ব্যবহৃত হইয়া 'অপিধান' এবং 'অপিহিত' এই দুই পদ বিদ্যমান ছিল—যাহাদের অর্থ 'আবরণ', 'অপি' উপসর্গ আবার সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করিয়া 'পি' রূপ ধারণ করিয়াছিল—যথা—'অপিধান—পিধান; 'অপি'+'নহ'—'পিনদ্ধ', ইত্যাদি। en এর প্রতিরূপ শব্দ সংস্কৃতে নাই, en-এর অর্থ 'ভিতরে', ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ হইবে 'নি' (যেমন—'নিহিত, নিবাস' ইত্যাদি); গ্রীক ধাতু the-র প্রতিরূপ হইতেছে সংস্কৃত ধাতু 'ধা', এবং -sis প্রত্যয়ের সংস্কৃত প্রতিরূপ 'তি' বা '-তিঃ', thesis—'ধিতিঃ', বৈদিক ভাষায় 'ধিতি' পাওয়া যায়, লৌকিক সংস্কৃতে ইহার রূপ হয় 'হিতি'। তাহা হইলে দাঁড়ায় epi+en-thesis=**অপি নি-হিতিঃ**, বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য, এই পূর্বাভাসাত্মক আগম বা বিপর্যয়কে অতএব **অপিনিহিতি** বলা যাইতে পারে;—'উপরে বা অধিকন্তু অভ্যন্তরে সংস্থাপন'—এইরূপ অর্থ এই নব-সৃষ্ট শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইবে, এই মৌলিক অর্থের দ্বারা উদ্দেশ্য অর্থ অনায়াসে দ্যোতিত হইতে পারে; এর সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে প্রচলিত Epenthesis শব্দের সহিত ইহার ধ্বনি ও সাম্য এবং অর্থ-গত সমতাও পাওয়া যাইবে। 'অপিনিহিতি'-র বিশেষণে 'অপিনিহিত' শব্দ (epenthetic অর্থে) প্রযুক্ত হইতে পারিবে।

[৩] তৃতীয় প্রকারের পরিবর্তন অপিনিহিতির ফলেই ঘটিয়া থাকে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। অপিনিহিতির ফলে যে 'ই' বা 'উ' আগে চলিয়া আইসে, তাহা পূর্বের অক্ষরে অবস্থিত 'অ' বা 'আ' বা অন্য স্বরের পার্শ্বে বসিয়া,

ভারতের বাহিরের বহু ভাষাতেও এই পরিবর্তন দেখা যায়। Indo-European ইন্দো-ইউরোপীয় (আর্য) ভাষার Germanic জরমানীয় শাখার ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে এই প্রকারের ধ্বনি-বিকার খুবই সাধারণ, এবং এই ভাষাগুলিতেই এই ধ্বনি-বিকারের প্রথম আলোচনা হইয়াছিল। ইংরেজী ও জরমান ভাষায় এই রীতির বহুল প্রয়োগ ঘটিয়াছিল, কতকগুলি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝা যাইবে। প্রাচীন-ইংরেজী * Francisc > Frencisc (১৩০-৫৪। ই কারের অপিনিহিতি, * Franicisc রূপে পরিবর্তন, পরে i ই কারের প্রভাবে পড়িয়া a অ-কারের e এ-কারে পরিণতি) > আধুনিক-ইংরেজী French; প্রাচীন-ইংরেজী একবচনে mann (= মানুষ), বহুবচনে * mann-iz, তাহা হইতে * menn-i * menn > menn, আধুনিক ইংরেজী man—বহুবচনে men; fōt (= পা)—বহুবচনে * fōt-iz—পরে fœt, তাহা হইতে fēt, আধুনিক foot—feet; প্রাচীনতম ইংরেজী * hari-a (হারিয়া-সেনা) > প্রাচীন-ইংরেজী here (= সেনা, এখন এই শব্দটী লুপ্ত); তদ্রূপ brother—brethre (brethre), জরমানের Bruder—Brüder (Brueder), food—feed প্রভৃতি বহুবচনের ও ক্রিয়ার রূপের উদ্ভব এই নিয়মে।

এই ধ্বনি-পরিবর্তন বা বিকারের কি নাম দেওয়া যায়? জরমান ভাষায় ইহা প্রথম আলোচিত হয়, এবং জরমান পণ্ডিতের ইহার একটী বেশ নামকরণ করিয়াছেন; Klopstock ক্লপ্‌ষ্টক্‌-কর্তৃক খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে এই নাম সৃষ্ট হইয়া প্রথম ব্যবহৃত হয়। নামটী হইতেছে Umlaut (উম্‌লাউট্‌)। এই জরমান শব্দটী ইংরেজীতেও বহুশঃ গৃহীত হইয়াছে, ইংরেজীতে আর একটী নাম ব্যবহৃত হয়—Vowel Mutation (ফরাসীতে Mutation vocalique)। Umlaut শব্দটী জরমান উপসর্গ um কে (যাহার অর্থ, 'চতুর্দিকে, অভিতঃ, প্রতি, উপরে', এবং সংস্কৃত 'অভি' উপসর্গ হইতেছে যাহার প্রতিরূপ), ধ্বনি-বাচক শব্দ Laut-এর সহিত যুক্ত করিয়া Umlaut শব্দের সৃষ্টি; মোটামুটী অর্থ, 'ঘুরিয়া পরিবর্তিত ধ্বনি'। এই Umlaut শব্দের

আছে—যথা 'কেতক > কেঅঅ > কেয়া', ক্বচিৎ 'কেওয়া=কেয়া'; এবং য-শ্রুতির অনুরূপ 'ব-শ্রুতি' ও প্রাকৃতে ও আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলিতে আছে—যেমন, 'কেতক-ট- > কেঅঅড- > কেবঅড- > কেবড়-=কেওড়া' ইত্যাদি। ভারতীয় ব্যাকরণে 'য-শ্রুতি' আছে, ভারতীয় ভাষার ইতিহাসে 'ব-শ্রুতি'-ও মিলে, এবং পারিভাষিক শব্দ 'ব শ্রুতি'-ও চলিবে; 'অভিশ্রুতি'তে তদ্রূপ কোনও আপত্তি হইতে পারে না। 'অভি'-উপসর্গ দিয়া উচ্চারণ-তত্ত্বের আর একটী সংজ্ঞা প্রাতিশাখ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে—'অভিনিধান'—পদের অন্তে হলন্ত বা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে সংস্কৃতে একটী বৈশিষ্ট্য আসিত, সেই বৈশিষ্ট্য এই শব্দ-দ্বারা দ্যোতিত হইত।

[৪] চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন—ধাতুর মূল স্বরবর্ণকে অবলম্বন করিয়া। এই পরিবর্তনের মূল বাঙ্গালায় মিলে না—প্রাকৃতের মধ্য দিয়া ভারতের আদি আর্যভাষায় (সংস্কৃতে) ইহার মূল পাওয়া যায় যেমন—'চলে < চলই < চলদি < চলতি; চালে < চালেই < চালেদি < চালেতি < *চালয়্‌তি < চালয়তি, চল < চলঃ; চাল < চালঃ; টুটে < টুট্টই < টুট্টই < টুট্টদি < টুট্টতি < ত্রুট্যতি; তোড়ে < তোড়ই < তোড়েই < তোড়েদি < তোড়েতি < তোটেতি < তোটয়তি < ত্রোটয়তি—টুট্=ত্রুট্, তোড়=ত্রোট; মন—মান, দিশা—দেশ < দিশ্, দেশঃ', ইত্যাদি। ধাতু-নিহিত স্বরধ্বনির এই প্রকারের পরিবর্তন, বাঙ্গালায় সাধারণতঃ সহজে ধরা যায় না,—'চল—চাল', 'পড়—পাড়' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দে 'অ—আ'-র অদল-বদল যেখানে দেখা যায়, সেখান-ছাড়া অন্যত্র স্বর-সঙ্গতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি আসিয়া প্রাচীন ধাতু-গত স্বরধ্বনির নিয়মিত পরিবর্তনকে উলট-পালট করিয়া দিয়াছে। হিন্দী প্রভৃতি অন্য ভারতীয় আর্য-ভাষাতেও এই পরিবর্তন দেখা যায়, যথা—'মরনা > মারনা, খিঁচনা > খেঁচনা, তপনা > তাবনা (তপ্যতে—তাপয়তি > তপ্পই—তাবেই > তপে—তাবে), জলনা—বারনা (জলতি—জ্বালয়তি > জলই—বালেই > জলে—বারে), নিকলনা—নিকালনা, কটনা—কাটনা, পালনা—পলনা'; ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যায়, এই পদ্ধতি-অনুসারে ধাতুর

স্বরধ্বনির নূতন রূপ গ্রহণ করা, আধুনিক আর্যভাষাগুলিতে আর জীবন্ত রীতি নহে—প্রাকৃত হইতেই এই রীতির ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

ধাতুর স্বরধ্বনির বিভিন্ন রূপ গ্রহণ সংস্কৃত ভাষার কিন্তু একটী বিশিষ্ট রীতি। সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ এই রীতিকে পূর্ণ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, এবং 'গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ',—এই তিনটী সংজ্ঞা দ্বারা এই পরিবর্তনের ধারাকে অভিহিত করিয়াছেন।

নিম্নে গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের কার্য প্রদর্শিত হইতেছে—

ধাতু (সরল বা মূল রূপ)	গুণ	বৃদ্ধি	সম্প্রসারণ
বদ্ ধাতু	বদ্ (বদতি, বদংবদ)	বাদ্ (অনুবাদ)	উদ্ (অনুদিত)
যজ্ ধাতু	যজ্ (যজতি, যজ্ঞ)	যাজ্, যাগ্ (যাজক, যাগ, যাজ্ঞিক)	ইজ্ (ইজ্যা, *ইজ্‌তি >ইষ্টি)
বিদ্ ধাতু বিদ্ (বিদ্যা)	বেদ (বেদ)	বৈদ্ (বৈদ্য)	
শ্রু ধাতু	শ্রউ = শ্রব্, শ্রো (শ্রবণ, শ্রোতা)	শ্রৌ = শ্রাউ, শ্রাব্ (শ্রাবক, শ্রৌত)	
দুহ্ ধাতু দুহ্, দুগ্ (দুগ্ধ)	দোহ্, দোঘ্ (দোহন, দোগ্ধা)	দৌহ্, দৌঘ্ (দৌগ্ধ)	
নী ধাতু নী (নীতি)	নই = নয়্, নে (নয়ন, নেতা)	নৈ = নাই, নায়্ (নৈতিক, নায়ক)	
ধৃ ধাতু ধর্, ধৃ (ধৃতি)	ধর্ (ধরণ, ধরা)	ধার্ (ধারণ)	
কৢপ্ ধাতু কৢপ (কৢপ্তি)	কল্প্ (কল্পনা)	কাল্প্ (কাল্পনিক)	

ধাতুর স্বরের গুণ-বৃদ্ধি সম্প্রসারণাত্মক পরিবর্তন সংস্কৃতের ন্যায় ভারতের বাহিরের অপর ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় মিলে। এইরূপ পরিবর্তন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর একটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যথা—

গ্রীকে—

péda (= পাৎ, পাদ)	póda	pos	epi-bd-ai

dérkomai (= দর্শামি) dedorka (= দদর্শ) é drakon (= অদর্শম্)

tithēmi (= দধামি)	thēmos (= ধামঃ)	thetós (= হিতঃ)

লাতীনে—

fīdo (= বিশ্বাস করি)	foedus	fides (বিশ্বাস)
dō (দদামি)	dōnum (দানম্)	datus (দত্তঃ)
canō (গান করি)	cecini (আমি গাহিলাম)	cantus (গান)

গথিকে—

bindan (= bind বন্ধ্ ধাতু)	band	bundum	bundans
bairan (= bear ভৃ ধাতু)	bar	bērum	baúrans
saíxwan (= see সচ্ ধাতু)	saxw	sēxwum	saíxwans (x = h)
letan (= let)	lailot	lailotum	lētans

ইংরেজীতে—

bind	bound	bounden	
bear	bore	born	
see	saw	seen	
sing	sang	sung	song

প্রাচীন-আইরীশে—

tíag (আমি যাই)	techt (গমন)
melim (চূর্ণ করি)	mlith (চূর্ণ করা)
saidid (ব্যবস্থা করে)	síd (সন্ধি)
il (বহু)	uile (সকল)
lín (সংখ্যা)	lán (পূর্ণ)

প্রাচীন-স্লাবে—

vedō (নয়ন করি)	(voje-)	voda	vĕs = ved-som
			pro-važdati = vadjati
tokō (দৌড়াই)	tokŭ	tociti	tĕxŭ = teksom
			pre-tĕkati, ras-takati

আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধাতুর মূল স্বর অবিকৃত থাকিত না, নানা অবস্থায় তাহার পরিবর্তন ঘটিত। ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ ষাট বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া গবেষণা ও আলোচনার পর এই পরিবর্তনের ধারাটী নির্ণয় করিয়াছেন। এই ধারার অন্তর্নিহিত সূত্রটীরও বহু বিচার করা হইয়াছে। ধাতুর স্বরধ্বনির যে সকল পরিবর্তন দেখা যায়, সেগুলির মূল-সূত্রটী হইতেছে এই :—প্রত্যয় বা বিভক্তির দ্বারা যুক্ত হইয়া ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতু, পদ-রূপে ব্যবহৃত হইবার কালে stress accent বা শ্বাসাঘাত এবং pitch accent বা উদাত্তাদি স্বরের প্রভাবে পড়িত, এবং সেই ধাতুর আভ্যন্তরীণ মূল স্বরধ্বনি, প্রসারে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ও প্রকৃতিতে অর্থাৎ উচ্চারণ-স্থানের পরিবর্তনে নব নব রূপ ধারণ করিত, এবং কচিৎ-বা শ্বাসাঘাতের একান্ত অভাবে লুপ্ত হইয়াও যাইত ; যথা,—

মূল ধাতু ed (=সংস্কৃত 'অদ্')—প্রকৃতি-গত বা গুণ-গত পরিবর্তনে হইল od , তদনন্তর এই দুইটী হ্রস্ব রূপ, মূল-রূপে গৃহীত ed ও তদবিকার-জাত od, ইহাদের উভয়ের প্রসারে হইল দীর্ঘ ēd, ōd , এবং শ্বাসাঘাতের একান্ত অভাবে, মূল স্বরধ্বনির লোপের ফলে, মাত্র -d রূপ লইয়া দাঁড়াইল , ফলে, ধাতুর বিভিন্ন রূপ হইল এই,—

ed od ēd ōd -d

আদি ইন্দো-ইউরোপীয়ের e, o, a, এই তিনটী হ্রস্ব ধ্বনি সংস্কৃতে একটী মাত্র রূপ a বা অ-কারে পর্যবসিত হয়, এবং তদ্রূপ ইন্দো-ইউরোপীয় দীর্ঘ ē ō ā-ও সংস্কৃতে মাত্র দীর্ঘ ā বা আ-কারে পর্যবসিত হয় ; সুতরাং—

হ্রস্ব ed-, od-এর স্থলে সংস্কৃতে দাঁড়াইল ad = 'অদ্', ও দীর্ঘ ēd-, ōd-এর স্থলে সংস্কৃতে দাঁড়াইল ād = 'আদ্' ; এইরূপে 'অদ্' ধাতুর ফল হইল, 'অদ্-' (গুণ), 'আদ্-' (বৃদ্ধি) ও '-দ্' (লোপ) ; যথা—

'অদ্-তি = অত্তি' ; 'অদ্ অন-ম্ = অদনম্' ; 'অদ্-ন- = অন্ন' ; 'আদ' (লিট্) ; 'অদ্'>'দ্'+'-অন্ত্' (শতৃ) = 'দন্ত্' (যাহা খাদন ক্রিয়া করে)।

গুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ—এক সূত্রে এই তিনটীকে গ্রথিত করিয়া দেখিলে, প্রত্যয়ের ও ধাতুর স্বরধ্বনির পরিবর্তনের সমস্ত ব্যাপারটী সহজবোধ্য হইয়া পড়ে। আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতু যেখানে নিজের মূল রূপে থাকে, এবং যেখানে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, কিন্তু প্রসার বা দীর্ঘীকরণ হয় না, সেইরূপ স্থলে সংস্কৃতে আমরা 'গুণ' পাই, আর যেখানে ইহার নিজ মূল প্রকৃতির বা পরিবর্তিত প্রকৃতির প্রসার বা দীর্ঘীকরণ পাই, সেইরূপ স্থলে সংস্কৃতে পাই 'বৃদ্ধি' ; এবং যেখানে ধাতুর মূল স্বরের লোপ, ও ফলে 'য র ল ব' (অর্থাৎ 'ই+অ, ঋ+অ, ঌ+অ, উ+অ') স্থলে যেখানে 'য্ র্ ল্ ব্' বা 'ই, ঋ, ঌ, উ' পাই, সংস্কৃতে সেখানকার এই পরিবর্তনকে বলে 'সম্প্রসারণ'। আদি ইন্দো ইউরোপীয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে বুঝা যায় যে, ইহাই হইল গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের মূল কথা।

সমগ্র ব্যাপারটীকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে না দেখিয়া, গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ এইরূপ আলাহিদা আলাহিদা নাম না দিয়া, একটী ব্যাপক সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। ইউরোপে এইরূপ ব্যাপক নামকরণ হইয়াছে, এবং একাধিক শব্দ জরমান, ইংরেজী ও ফরাসীতে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৮১৯ সালে জরমান ভাষাতত্ত্ববিৎ Jakob Grimm য়াকোব গ্রিম্ জরমান ভাষার প্রথম আধুনিক ভাষাতত্ত্বানুসারী ব্যাকরণ লিখেন। তখন তিনি এই স্বর-পরিবর্তনের নাম করিবার জন্য জরমান ভাষায় (এই প্রবন্ধে প্রাগালোচিত Umlaut শব্দের অনুরূপ) একটী শব্দ সৃষ্টি করেন—সে শব্দটী হইতেছে Ablaut, উপসর্গ ab-এর সঙ্গে পূর্ববর্ণিত Laut শব্দের যোগ। Ab উপসর্গের ইংরেজী প্রতিরূপ হইতেছে off, ও সংস্কৃত প্রতিরূপ 'অপ'। সম্পূর্ণ শব্দটীর সংস্কৃত প্রতিরূপ হইবে 'অপশ্রুত', কিন্তু Umlaut-এর প্রতিরূপ-হিসাবে যেমন 'অভিশ্রুত' না ধরিয়া, 'অভিশ্রুতি'কে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছি, তদ্রূপ এখানেও অপশ্রুত না বলিয়া **অপশ্রুতি**ই গ্রহণ করিতে চাই। ধাতুর মূল স্বরধ্বনির—মূল

শ্রুতির—অপ-গমন বা বিকার,—ইহাই হইবে 'অপশ্রুতি'র ধাতুগত অর্থ। প্রাকৃত ব্যাকরণের 'য় শ্রুতি,' তদবলম্বনে প্রযুক্ত 'ব-শ্রুতি,' এবং নব-সৃষ্ট 'অভিশ্রুতি'র পার্শ্বে এই 'অপশ্রুতি' শব্দ, ধ্বনি- বা উচ্চারণ-গত পরিবর্তনের সংজ্ঞা-হিসাবে, সহজ ভাবেই এক পর্য্যায়ের হইয়া দাঁড়াইবে। Ablaut বা অপশ্রুতির অন্য কয়েকটী নাম যাহা ইউরোপে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হইতেছে ইংরেজী Vowel Alternance, বা স্বরের নিয়ন্ত্রিত আগমন বা পরিবর্তন, ফরাসীতে Alternances vocaliques; কিন্তু ইংরেজীতে Ablaut শব্দটীও বহুশঃ গৃহীত হইয়া গিয়াছে; এবং এতদ্ভিন্ন, Ablaut-এর গ্রীক প্রতিশব্দ দিয়া একটী শব্দ ভাষাতাত্ত্বিকেরা ব্যবহার করিতেছেন, বিশেষতঃ ফরাসীরা, যাহারা জরমান Ablaut শব্দ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, অথচ Alternance vocalique অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত নাম চাহেন; ab-এর গ্রীক প্রতি-রূপ apo, এবং Laut-এর গ্রীক প্রতি শব্দ phōnē, এই দুই মিলাইয়া, গ্রীক Apophōnia, তাহা হইতে লাতীন Apophonia শব্দ কল্পনা করিয়া, এই Apophonia শব্দকে ইংরেজীতে Apophony এবং ফরাসীতে Apophonie রূপ ভাঙ্গিয়া প্রয়োগ করিতেছেন। যাহা হউক, সংস্কৃত শব্দ 'অপশ্রুতি'-দ্বারা বাঙ্গালা প্রভৃতি আমাদের ভারতীয় ভাষায় কাজ চলিবে, এরূপ আশা করা যায়। 'চল—চাল', 'টুট—তোড়', 'দিশা—দেশ', 'পড়—পাড়', প্রাচীন বাঙ্গালার 'বিদু (= বিদুৎ)—বেজ্জ (= বৈদ্য)'—এই প্রকারের স্বরবৈচিত্র্যকে অতএব ইন্দো-ইউরোপীয় 'অপশ্রুতি'র ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন স্বরধ্বনি-ঘটিত অন্য যে সকল রীতি বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, সেগুলির নাম বিদ্যমান আছে;—যথা, লোপ ও আগম (আদ্য, মধ্য, অন্ত্য), এবং স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Anaptyxis)। এগুলি লইয়া আলোচনা এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে প্রস্তাবিত **স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি** ও **অপশ্রুতি** বাঙ্গালা ভাষায় চলিতে পারিবে কি না, সুধীবর্গ তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন।

বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৩১ সালের লোকগণনা-অনুসারে পাঁচ কোটির অধিক সংখ্যক লোকে বাঙ্গালা বলে। বাঙ্গালা দেশের সর্বত্র বাঙ্গালা ভাষা চলে, তদতিরিক্ত বিহারের সাঁওতাল-পরগণায়, মানভূমে ও পূর্ণিয়া জেলায়, এবং আসামের গোয়ালপাড়া, শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত। ভারতবর্ষের অন্য অন্য প্রদেশেও অল্প-স্বল্প বাঙ্গালা-ভাষী আছে। লোকসংখ্যা হিসাবে বাঙ্গালা ভাষাকে পৃথিবীর সাত আটটী প্রধান ভাষার মধ্যে একটী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইংরেজী, উত্তরের চীনা, রুষ, জরমান, স্পেনীয়, জাপানী—এগুলির পরেই বাঙ্গালার স্থান। আমাদের দেশে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষারই প্রসার এবং প্রভাব খুব বেশী,—প্রায় দের কোটি লোকে হিন্দুস্থানী ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু হিন্দুস্থানী যাহারা কেবলমাত্র বাহিরের ভাষা বা পোষাকী ভাষারূপে ব্যবহার না করিয়া, ঘরের মাতৃভাষা-রূপে বলিয়া থাকে, তাহাদের সংখ্যা বঙ্গভাষীদের চেয়ে ঢের কম।

পৃথিবীর অন্য সমস্ত ভাষার মত বাঙ্গালা ভাষারও নানা রূপ আছে। যে-সকল ভাষায় বহুদিন ধরিয়া লিখিত সাহিত্য বিদ্যমান, প্রায় দেখা যায় যে, সেগুলিতে ভাষার সাহিত্যিক রূপ ও সাধারণ কথোপকথনের রূপের মধ্যে অল্প-বিস্তর পার্থক্য আছে। সাহিত্যিক ও কথ্য-ভেদে বাঙ্গালা ভাষারও বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। প্রথম—বাঙ্গালার সাহিত্যিক রূপ—বা 'সাধু ভাষা'; সাধারণতঃ এই সাধু ভাষায় সমগ্র বঙ্গদেশে গদ্য-সাহিত্য চিঠিপত্রাদি লিখিত হইয়া থাকে। সাধু ভাষার পাশাপাশি নানা অঞ্চলের কথিত বা মৌখিক বাঙ্গালা বিদ্যমান। এইগুলির মধ্যে কলিকাতা-অঞ্চলের* এবং ভাগীরথী-নদীর দুই তীরের ভদ্রসমাজের লোকেদের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা সাধারণতঃ সমগ্র

বঙ্গদেশের শিক্ষিত জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে ; বিভিন্ন স্থানের লোকে একত্র কথাবার্তায় সকলেই কলিকাতা-অঞ্চলের এই ভাষা বলেন, বা বলিতে চেষ্টা করেন , এই বিশিষ্ট মৌখিক ভাষাকে 'চলিত ভাষা' বলা হয়। 'সাধু-ভাষা' ও 'চলিত ভাষা'-কে ইংরাজীতে যথাক্রমে Standard Literary Bengali (অথবা High Bengali) এবং Standard Colloquial Bengali রূপে অনুবাদ করা হইয়াছে। সাধু ভাষার ন্যায় চলিত-ভাষাও আজকাল সাহিত্যে খুব ব্যবহৃত হইতেছে,—সাধু-ভাষার পার্শ্বে গদ্য সাহিত্যেও ইহার একটা স্থান হইয়াছে। পদ্য-সাহিত্যে বিশুদ্ধ সাধু ভাষা অপেক্ষা বিশুদ্ধ চলিত-ভাষা অথবা মিশ্র সাধু ও চলিত ভাষারই প্রচলন বেশী।

নিম্নে বিভিন্ন কতক প্রকারের বাঙ্গালার নিদর্শন দেওয়া হইল :—

[১] **সাধু-ভাষা**—সেকালে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে ছিল। সে যখন আসিয়া বাটীর নিকটবর্তী হইল, অমনই নৃত্য-গীত-বাদ্যাদির ধ্বনি শুনিতে পাইল। তাহাতে সে একজন ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এই সকল ব্যাপারের অর্থ কি? ভৃত্য উত্তর দিল—আপনার ভ্রাতা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ও আপনার পিতা তাঁহাকে নিরাপদে সুস্থ শরীরে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া আনন্দোৎসব করিতেছেন।

[২] **চলিত-ভাষা (কলিকাতা, ভাগীরথী-তীর)**—তখন তার বড়ো ছেলে ক্ষেতে ছিল, সে এসে বাড়ীর কাছে যেমনি পৌঁছুলো, অমনি নাচ গান বাজনার শব্দ শুনতে পেলে। তখন সে একজন চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেসা ক'রলে—এসব ব্যাপার হ'চ্ছে কেন? তাতে চাকর ব'ললে—আপনার ভাই ফিরে এসেছেন, আর আপনার বাবা তাঁকে ভালোয়-ভালোয় ফিরে পেয়েছেন ব'লে নাচ-গান খাওয়ান-দাওয়ান ক'রছেন।

[৩] **মানভূমের মৌখিক ভাষা** (পশ্চিম-বঙ্গ) ই লোকটার বড়ো বেটা তেখ্‌নে খেতে গেলছিলো, সে ফিরতি সময়ে যখ্‌নে আপনাদের ঘরের পাশ হাব্‌ড়ালো, তখ্‌নে নাচ-বাজ্‌নার ধুম শুনতে পালে' একজন মুনিশকে ডাকিয়ে পুছ্‌লেক যে এসব কিসের লিয়ে হচ্ছে রে? মুনিশটা ব'ল্‌লেক তুমার ভাই আইছেন ন, এতাতে তুমার বাপ কুটুম খাওয়াছেন, কেনন উহাকে ভালায়-ভালায় পাওয়া গেলছে।

[৪] **রাজবংশী** (উত্তর-বঙ্গ)—তখন তার বড় বেটা পাতারে বাড়ীৎ আছিল। পাছোৎ তাঁয় আসতে-আসতে বাড়ীর কাছোৎ যায়া নাচ-গানের শোর শুনবার পাইল। তখন তাঁয় একজন চেঙরাক ডাকেয়া পুছ করিল—ইগলা কি? তখন তাঁয় তাক কৈল্, তোর ভাই আইচে, তোর বাপ্ তাক ভালে-ভালে পায়া একটা বড় খাওয়া ক'রচে।

[৫] **ঢাকা, মাণিকগঞ্জ** (পূর্ব-বঙ্গ)—তার বড়' পোলা তখন মাঠে আছিলো। সে বাড়ীর দিগে যতই আইগাইবার লাইগ্‌লো, ততই বাজনা আর নাচ শুইনবার লাইগ্‌লো। তারপর একজন চাকররে ডাইকা জিগ্‌গাসা কৈলো—ইয়ার মানে কি? সে কৈলো তোমার ভাই আইচে, তারে ভালে-ভালে পাইয়া তোমার বাপে এক খাওয়া দিচেন।

[৬] **শ্রীহট্ট**—ঐ সময় তার বড় পুত খেতে ছিল। হে বাড়ীর ধার' আইতে নাচ-গানের শব্দ হুনল। হে একজন চাকরের ডাকিয়া জিগাইল—এ হকল (ইতা) কিতা? হে তা'রে ক'ইল, তোমার ভাই বাড়ীৎ আইছে, এর লাইগ্যা তোমার বাপ বড় খানি দিছইন, কারণ তারে ভালা-আলা ফিরা পাইছইন্।

[৭] **চট্টগ্রাম**—হার বড় পোয়া বিলৎ আছিল। হে যখন ঘরর কাছে আইল, তখন নাচন্ গায়ন্ হুনিল। হে আর একজন গাউররে ডাই জিজ্ঞাইল যে কি হইয়ে? হে তারে কইল—আঁওনার ভাই আইস্যে, আঁওনার বাবে তারে আরামে পাইয়ারে এক নিমন্ত্রণ দিয়ে।

[৮] **বরিশাল**—হে কালে হের বড় পোলা, ক্ষেতে আছিল। হে বাড়ীর কাছে আইয়া গাওন, নাচন হুনিতে পাইয়া একজন চাহর ডাকিয়া জিগাইল যে এয়া কি? সে কৈল—তোমার ভাই আইছে, আর তোমার বাপ মস্ত খানা খোলাইর হরছে, কারণ ছোট পোলা বাঁ-বাঁচাইতে পাইছে।

বাঙ্গালা দেশের রাজধানী কলিকাতা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ও কর্মকেন্দ্র হওয়ায়, এবং সাহিত্যিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল বিষয়ের কেন্দ্র হওয়ায়, কলিকাতা-অঞ্চলে ব্যবহৃত মৌখিক ভাষা গত দেড় শত বৎসরের অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গালা দেশের সর্বশ্রেণীর অধিবাসীর উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন, বিগত তিন চারি শত বৎসর ধরিয়া ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত নবদ্বীপ ও বাঙ্গালার আধ্যাত্মিক ও আধিমানসিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া আসিয়াছে।

সাহিত্যিক বিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই পশ্চিম বঙ্গের এই অঞ্চলের একটা প্রাধান্য সমগ্র বঙ্গদেশে স্বীকৃত। কলিকাতার মৌখিক ভাষা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত, এবং সমস্ত বিষয়ে এই প্রাধান্যের অধিকারী। কলিকাতা-নিবাসী এবং কলিকাতা প্রবাসী বহু বাঙ্গালী লেখক সজ্জন-আদৃত কলিকাতার এই চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, এবং করিতেছেন। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলে, সাধু-ভাষা এবং চলিত ভাষা—বাঙ্গালা ভাষার এই উভয় রূপই আলোচ্য। চলিত-ভাষার নিজের নানা বৈশিষ্ট্য, নানা নিয়ম আছে।

সাধারণতঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণে সাধু-ভাষারই আলোচনা থাকে, চলিত ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ থাকে না। চলিত-ভাষার শিষ্ট প্রয়োগ আমরা হয় জন্মগত অধিকারে শিশুকাল হইতেই শিখিয়া থাকি, নয় ব্যবহারিক জীবনে শিক্ষিত লোকের কথাবার্তায় এবং সাহিত্যে ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করিয়া ইহার রীতি নীতি আয়ত্ত করিয়া লই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা হইতে তথা আধুনিক সাধু-ভাষা হইতে, চার পাঁচ শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালা ভাষার একটা মোটামুটী ধারণা করিতে পারা যায়। মৌখিক ভাষায় বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা বলি 'দেখে, দেখ্যে, দেখ্যা, দাখে, দাইখ্যা' প্রভৃতি; আধুনিক সাধুভাষার রূপ 'দেখিয়া' (এই পূর্ণ রূপ কোনও কোনও অঞ্চলের মৌখিক ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়), এবং প্রাচীন সাহিত্যের রূপ 'দেখিঞা, দেখিয়া, দেখি'—এইগুলিই হইতেছে আধুনিক মৌখিক রূপগুলির মূল,—পাঁচ শত বৎসর পূর্বে যখন আধুনিক কথ্য ভাষার রূপগুলির উদ্ভব হয় নাই, তখন লোকে 'দেখি, দেখিয়া' বা 'দেখিঞা' বলিত।

আধুনিক সাধু ভাষায় দুইটী বিষয় লক্ষণীয়—ইহার ক্রিয়া, সর্বনাম প্রভৃতির রূপগুলি মৌখিক ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত রূপসমূহ অপেক্ষা পূর্ণতর, এবং উহাদের মূল-স্থানীয়, এবং সাধু-ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ একটু বেশী, প্রাদেশিক মৌখিক ভাষায় নিবদ্ধ শব্দের ব্যবহার ইহাতে কম। প্রাচীন কালে মৌখিক ভাষায় ও সাহিত্যের ভাষায় ব্যাকরণ-ঘটিত পার্থক্য তত বেশী ছিল না।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে, মুখ্যতঃ পশ্চিম-বঙ্গের ভাষার আধারের উপরে, পুরাতন বাঙ্গালার সর্বজন-গ্রাহ্য একটী সাহিত্যের ভাষা দাঁড়াইয়া যায়। এই প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার ধারাটিকে অনেকটা অবিকৃত রাখিয়াই আধুনিক সাধু ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। প্রাচীন রূপটী বিশেষ করিয়া ক্রিয়াপদে ও সর্বনামেই বহুল পরিমাণে সাধু-ভাষায় অপরিবর্তিত আছে। মাত্র গত এক শত পঁচিশ বৎসরের কিছু অধিক হইল, সাধু-ভাষায় বা আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অতি-বাহুল্য ঘটিয়াছে।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৩০০ হইতে এখন পর্যন্ত ধারাবাহিক রূপে বাঙ্গালা ভাষার নিদর্শন আমরা পাইতেছি। প্রাচীন পুঁথিতে ও প্রাচীন কালে রচিত সাহিত্যের গ্রন্থে সে কালের ভাষা পাওয়া যায়। এই ভাষা আধুনিক সাধু-ভাষা হইতে বেশী পৃথক নহে। পার্থক্য, যাহা কিছু, তাহা প্রধানতঃ শব্দ লইয়া। প্রাচীন ভাষার বহু শব্দ আজকাল লোপ পাইয়াছে, বা পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং আধুনিক ভাষায় আমরা বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ও বিদেশী শব্দ ব্যবহার করি। এখন হইতে পাঁচ শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালার নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হইল (পাঠককে শব্দগুলিকে উড়িয়া ভাষার মত যথাযথ করিয়া পড়িতে হইবে)—

কে না বাঁশী বাএ (= বাজায়) বড়ায়ি কালিনী নই (= কালিন্দী নদী, যমুনা) কূলে।
কে না বাঁশী বাএ, বড়ায়ি, এ গোঠ (= গোষ্ঠ) গোকুলে।
আকুল শরীর মোর—বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।
কে না বাঁশী বাএ, বড়ায়ি, সে না কোন জনা।
দাসী হঁআঁ (= দাসী হইয়া) তার পাএ নিশিবোঁ আপনা (= নিজকে নিক্ষেপ করিব)।
কে না বাঁশী বাএ, বড়ায়ি, চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি, মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে (= আমি কি দোষ করিলাম)।

আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ, বড়ায়ি, হারায়িলোঁ পরাণী।

আকুল করিতে কি বা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখী নহোঁ তার ঠাই (= ঠাঁই) উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ, পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে, আ গ (= আগো) বড়ায়ি, জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে, যেহ্ন (= যেন) কুম্ভারের পণী (= পন)॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন (= কান, কৃষ্ণ) অভিলাসে
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ [চণ্ডীদাস-কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বংশীখণ্ড]

মহাকবি চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী ছিলেন—চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদের গান নিজ আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ-স্বরূপ শুনিতেন ও গাহিতেন। কিন্তু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের কত পূর্বে ছিলেন তাহা জানা যায় না। চৈতন্যদেবের জন্মের তারিখ ১৪০৭ শকাব্দ (১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)। কবি বড়ু চণ্ডীদাসকে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের ব্যক্তি বলিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা ধরিয়া লইতে পারি। অন্ততঃ এইটুকু আমরা বলিতে পারি যে, বড়ু চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন’ মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম পুস্তক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্বেকার সময়ের বাঙ্গালা ভাষার নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। এই নিদর্শন একেবারে মুসলমান-পূর্ব যুগের (খ্রীষ্টাব্দ ১২০০ র) পূর্বেকার। তখন বাঙ্গালা ভাষা নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানধর্মাবলম্বী বিদেশী তুর্কীরা বাঙ্গালাদেশের অংশবিশেষ জয় করে, ও বাঙ্গালাদেশে মুসলমান রাজ্য ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করে। তুর্কীদের আসিবার পূর্বে পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের আমলে বাঙ্গালাদেশে সকল বিষয়েই একটা উন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। দেশ-ভাষায় কবিতা ও গান লেখাও হইত। তখন বৌদ্ধ ধর্মের নানা শাখা বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রবল ছিল, দেশের বহু লোকে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাধনা মানিত। সহজিয়া শাখার বৌদ্ধদের আচার্যেরা নিজেদের সম্প্রদায়ের সাধনা-সম্পর্কিত যে সব গান দেশ-ভাষায় রচিতেন, সেইরূপ কতকগুলি বাঙ্গালা গান বাঙ্গালার বাহিরে নেপালে প্রাচীন পুঁথিতে

পাওয়া গিয়াছে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজ-দরবারের গ্রন্থশালায় একখানি প্রাচীন পুঁথিতে এইরূপ সাতচল্লিশটী গান পাইয়া, ১৩২৩ বঙ্গাব্দে এই গানগুলিকে অন্য তিনখানি পুঁথির সহিত ছাপাইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত করেন। গানের বিষয়-বস্তু হইতেছে সহজিয়া বা তান্ত্রিক বৌদ্ধমার্গের সাধনের গূঢ় কথা। গানগুলিকে 'চর্যা' বা 'চর্যাপদ' বলা হয়। পুঁথিতে গান কয়টীর ভাষা বিশেষ ভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালার স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে এইগান কয়টীর মূল্য অপরিসীম। প্রাচীন বাঙ্গালা চর্যাপদের নিদর্শন-স্বরূপ নিম্নে কতকগুলি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল (প্রাচীন পুঁথির বানান একটু-আধটু পরিবর্তিত করা হইয়াছে)—

"রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খাই।"	(গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়)
"আইল গরাহক অপণেঁ বহিআ।"	(গ্রাহক আপনিই (পথ) বহিয়া আসিল।)
"ভবনই গহণ গম্ভীরবেগেঁ বাহী।	(ভবনদী গহন, গম্ভীর বেগে প্রবাহিত)
দু আন্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী।	(দু ধারে কাদা, মধ্যে থাই বা থই নাই)
ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।	(ধর্ম-হেতু সিদ্ধাচার্য চাটিল সাঁকো গড়ে)
পারগামী লোঅ নীভর তরই।"	(পারগামী লোকে নির্ভর তরে)
"নগর-বাহিরি রে ডোম্বী, তোহোরি কুড়িআ।	(ওরে ডোমনী, নগর-বাহিরে তোর কুঁড়ে)
ছোই ছোই জাইসি বাহ্মণ নাড়িআ।	(নেড়া বামুনকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাইস্)
হালো ডোম্বী, তো পুছমি সদভাবে।	(ওলো ডোমনী, তোকে সদ্ভাবে পুছি)
আইসসি জাসি, ডোম্বী, কাহরি নাবেঁ।"	(ওরে ডোমনী, কার নায়ে আসিস্ যাইস্)

উপরের নিদর্শন-মত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের রচিত পদগুলি এখন হইতে মোটামুটী হাজার বছর পূর্বেকার লেখা—খ্রীষ্টীয় ৯৫০ হইতে ১২০০-র মধ্যে। এগুলির ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা। এই প্রাচীন বাঙ্গালায় পশ্চিমা অপভ্রংশের কিছু কিছু রূপ আসিয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া আলোচনা না করিলে, সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক এই প্রাচীন ভাষা সহজে বুঝিতে পারিবে না।

এই প্রাচীন বাঙ্গালার পূর্বেকার সময়ের এদেশের ভাষার নমুনা পাওয়া

যায় নাই। খ্রীষ্টীয় ৮০০ কি ৯০০, কি ৬০০-তে গৌড়-বঙ্গের লোকেরা যে ভাষা বলিত, তাহাকে বাঙ্গালার পূর্ব রূপ বলা যায়। এই পূর্ব রূপ, 'প্রাকৃত' পর্যায়ে অর্থাৎ মধ্য অবস্থার আর্য ভাষার পর্যায়ে পড়ে, ইহাকে আর বাঙ্গালা অর্থাৎ আধুনিক আর্য ভাষার পর্যায়ে ফেলা যায় না। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির আলোচনার অর্থ হইতেছে এই যে, প্রাকৃত কি ভাবে পরিবর্তিত হইয়া বাঙ্গালা হইয়া দাঁড়াইল, তাহার আলোচনা।

অতি প্রাচীন কালে, এখন হইতে চারি হাজার পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে, এদেশে অনার্য জাতির লোকেরা বাস করিত। ইহারা মুখ্যতঃ কোল (অস্ট্রিক) ও দ্রাবিড় জাতির লোক ছিল—ইহাদের ভাষা আর্য-ভাষা সংস্কৃত হইতে একেবারে পৃথক। পরে পশ্চিম হইতে ইরান বা পারস্য দেশ হইয়া আর্যজাতির লোক কিছু কিছু ভারতবর্ষে আগমন করে, এবং দেশের অনার্যদের মধ্যে উপনিবিষ্ট হয়। এই ব্যাপার কবে ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা মত আছে; তবে অধুনা-লব্ধ অনেকগুলি বস্তু ও তথ্য হইতে অনুমান হয় যে আর্যদের ভারতে আগমন খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মধ্যভাগে বা দ্বিতীয়ার্ধে ঘটিয়াছিল (আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ পূঃ-তে)। নিজ ভাষা লইয়া আর্যজাতির ভারতবর্ষে আগমনের ফলে, উত্তর কালে এদেশে বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক আর্য ভাষার উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল। আর্যজাতির ভাষা ভারতে আসিয়া প্রথমটা যে রূপ ধারণ করে, সে রূপ আমরা ঋগ্বেদে পাই। ঋগ্বেদ ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ; এবং জগতের তাবৎ প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে ঋগ্বেদকেও ধরিতে হয়। ঋগ্বেদ প্রভৃতি চারি বেদ ও তৎপরবর্তী ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষাকে আমরা এখন 'বৈদিক সংস্কৃত' বা 'বৈদিক' বলি; প্রাচীন কালে ইহার আর একটী নাম ছিল—'ছন্দস্' বা 'ছন্দঃ', অর্থাৎ বৈদিক কবিতার ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি আর্যভাষার রূপ বৈদিক ভাষা অনেকটা রক্ষা করিয়া আছে। আদি আর্যজাতির মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই ভাষা আর্য-জাতির বিভিন্ন শাখা কর্তৃক ইউরোপ ও এশিয়ার নানা স্থানে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 'আদি-আর্য ভাষা' একদিকে যেমন বৈদিকের জননী,

এবং বৈদিক ভাষা হইতে বাঙ্গালা হিন্দী গুজরাটী মারহাট্টী সিন্ধী পাঞ্জাবী প্রভৃতি আধুনিক আর্যভাষাগুলি উদ্ভূত বলিয়া যেমন এগুলিরও মূল-স্বরূপ, তদ্রূপ অন্য দিকে ভারতবর্ষের বাহিরে যে সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বলা হয়—যথা ফারসী, আর্মানী, গ্রীক, আলবানীয়, বুল্গার, যুগোস্লাব, চেখ, পোল, রুশ, লেট্, লিথুআনীয়, সুইডিশ, নরউইজীয়, ডেনীয়, জরমান, ডচ্, ইংরেজী, আইরীশ, ওয়েল্শ্, ব্রেটন, ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয়, পোর্তুগীস প্রভৃতি—সেগুলিরও আদি জননী। এই সমস্ত ভাষার প্রাচীনতম রূপগুলির সহিত সংস্কৃতের (বা বৈদিকের) বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়—এক অধুনা-লুপ্ত আদি আর্য-ভাষার বিকারে এইগুলি উৎপন্ন। প্রাচীন আর্যভাষা—যথা বৈদিক, অবেস্তার ভাষা, প্রাচীন পারসীক, প্রাচীন আর্মানী, প্রাচীন গ্রীক, লাটীন, গথিক, প্রাচীন স্লাব, বোহারীয় প্রভৃতি—লইয়া আলোচনা করিয়া, ভাষা-তাত্ত্বিকগণ এই লুপ্ত আদি আর্যভাষার ধ্বনি, শব্দ ও প্রত্যয়াদি কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে অনেকটা অনুমান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং এই লুপ্ত ভাষার সম্ভাব্য রূপটী ধরিয়া দিয়াছেন। ইংরেজী ও বাঙ্গালা—এই দুইটী ভাষা একই ভাষা-গোষ্ঠীর বলিয়া পরস্পর-সম্পৃক্ত; দুইয়ের মধ্যে ধ্বনি ও রূপে এখন বিস্তর প্রভেদ, কিন্তু আধুনিক ইংরেজীর প্রাচীন রূপ Old English বা Anglo-Saxon, এবং আধুনিক বাঙ্গালার প্রাচীনতম রূপ, অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃত—এই উভয়কে মিলাইয়া দেখিলে, এই দুই ভাষার মৌলিক সাদৃশ্য বুঝা যাইবে। কতকগুলি উদাহরণ-দ্বারা বিষয়টী বিশদ করা যাইতেছে—

[১] বাঙ্গালা 'চাক্' cāk শব্দ < প্রাচীন বাঙ্গালা 'চাক' cāka < প্রাকৃত 'চক্ক' cakka < বৈদিক বা সংস্কৃত 'চক্রঃ, চক্রম্' cakraḥ, cakram: গ্রীকে kuklos কুক্লোস্: আদি আর্য সম্ভাব্য রূপ *qʷeqʷlos *'কেক্লোস'। এই আদি আর্য রূপ ইংরাজী ভাষায় এই রীতি অনুসারে পরিবর্তিত হইয়াছে—*qʷeqʷlos, *xʷexʷlaz (x = খ্‌, xʷ = খ্ব্‌) > hwegul > hweol wheel (hwil). 'চাক' ও wheel 'হ্বীল্' সমার্থক ও সম-মূল শব্দ, কিন্তু

এখন ইহাদের রূপে অর্থাৎ উচ্চারণে কত পার্থক্য, কিন্তু নিজ নিজ মাতৃস্থানীয় প্রাচীন ভাষা বৈদিকের ও পুরাতন-ইংরেজীর মধ্য দিয়া আদি আর্যভাষার মূল রূপে ইহাদের সমাধান হয়।

[২] আদি আর্যভাষায় *dn̥t—dent—dont : ইহা হইতে একদিকে বৈদিক ভাষায় 'দন্ত, দৎ-' শব্দের উদ্ভব, আবার গ্রীক odont-, লাতীন dens—dentis শব্দের উদ্ভব, এবং অন্য দিকে প্রাচীনতর ইংরেজীতে *tanθ (*tanth), পরে *tonth, toth ও আধুনিক ইংরেজী tooth. 'দন্ত' danta হইতে বাঙ্গালা হিন্দী 'দাঁত' dẵt শব্দ ; 'দাঁত' ও tooth 'টূথ্' সমানার্থক ও সম-মূল শব্দ

[৩] বাঙ্গালা 'মা' mā < প্রাচীন বাঙ্গালা 'মাঅ' māa < প্রাকৃত 'মাআ, মাদা, মাতা' māā, mādā, mātā < বৈদিক 'মাতা'—'মাতৃ বা মাতর্' শব্দ < আদি আর্য রূপ *mātēr, ইহা হইতে গ্রীক mātēr, বা mētēr, লাতীন māter, প্রাচীন ইংরেজী mōdor, এখনকার ইংরেজী mother (মধ়র্)।

এইরূপে আধুনিক আর্যভাষাগুলির প্রাচীন রূপ আলোচনা করিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বুঝিতে পারা যায়। সংস্কৃত, প্রাচীন-পারসীক, গ্রীক, লাতীন, গথিক্, প্রাচীন-ইংরেজী, প্রাচীন-স্লাব, প্রাচীন-আইরীশ প্রভৃতি প্রাচীন-আর্যভাষাগুলি যে একই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত, তাহা দুইটী বিষয় হইতে বুঝা যায় : [১] ইহাদের শব্দ-বিন্যাস ও বাক্য-বিন্যাসের পদ্ধতি এক প্রকারের ; এবং [২] ভাষায় ব্যবহৃত সাধারণ ধাতু ও শব্দ এবং প্রত্যয় ও বিভক্তি ইহাদের মধ্যে এক। বহুদূর দেশে ও কালে অবস্থিত পৃথক্ পৃথক্ একাধিক ভাষার জ্ঞাতিত্ব, ব্যাকরণ রীতি ও ধাতু এই দুইটী বিষয়ের সাদৃশ্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সংস্কৃত (এবং সংস্কৃতের আধুনিক রূপ বাঙ্গালা) এবং ইংরাজী, লাতীন ও গ্রীক প্রভৃতি এক গোষ্ঠীর ভাষা ; কিন্তু আরবী, তুর্কী, চীনা, তামিল, সাওতালী—এই ভাষাগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীর, সংস্কৃত গ্রীক ইংরেজী প্রভৃতির সহিত ইহাদের কোনও মৌলিক সম্পর্ক নাই।

নিম্নে প্রদত্ত বংশ-পীঠিকা-চিত্র হইতে আর্যভাষা-গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক সম্পর্ক বা সংযোগ স্পষ্টীকৃত হইবে। বৃক্ষের আকারে চিত্রদ্বারাও এই বংশ পরিচয় প্রদর্শিত হইল। বংশ-পীঠিকাচিত্র হইতে বাঙ্গালা ভাষার প্রতিবেশীদের পরিচয় জানা যাইবে।

[১] বাঙ্গালা ভাষার জ্ঞাতি স্থানীয় ভাষা

[২] বাঙ্গালা ভাষার প্রতিবেশী ভাষাসমূহ

[ক] Austric 'অস্ট্রিক' বা 'দক্ষিণ-দেশীয়' ভাষা-গোষ্ঠী
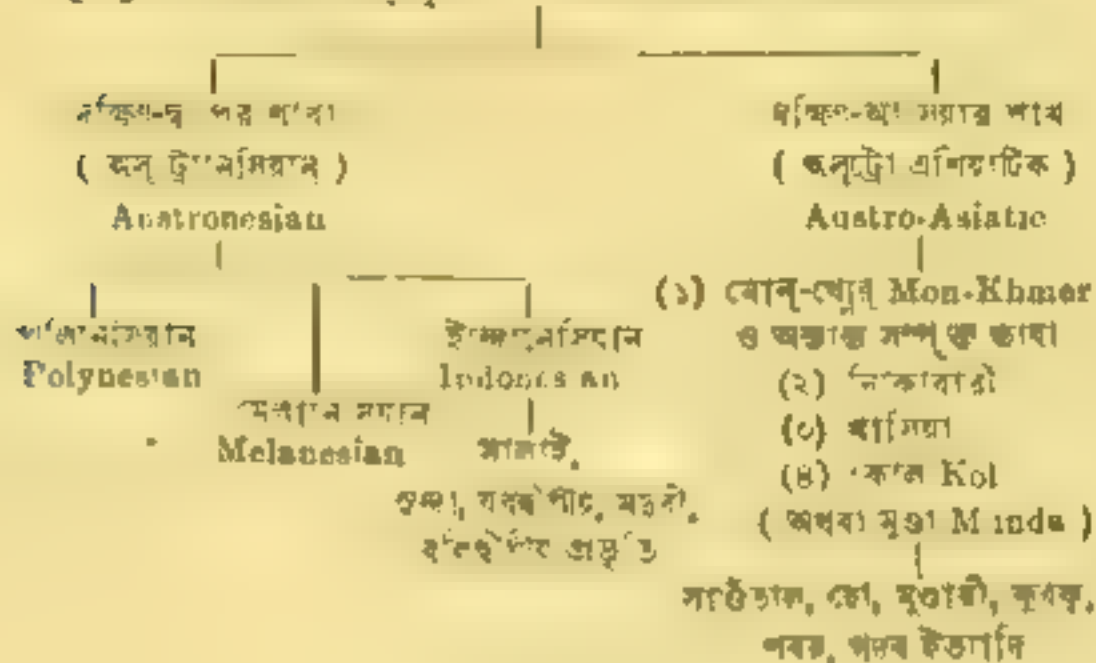
[খ] Dravidian দ্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠী
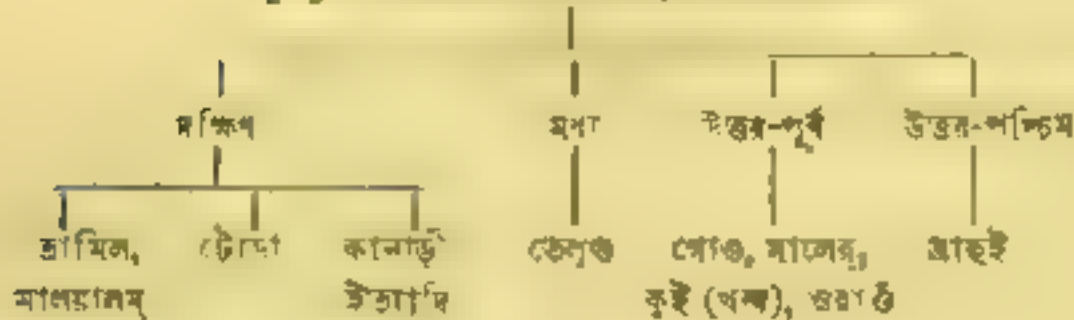
[গ] Sino-Tibetan (Tibeto-Chinese) ভোট-চীন ভাষা-গোষ্ঠী

ধ্বনি ও ব্যাকরণ-রীতি এবং অনার্য শব্দ-সম্ভার আনয়ন করিয়াছিল ও ইহার রূপ বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল। এই-সব কারণে, আর্যভাষা আর্য আগন্তুকদের মুখে যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থা আর বজায় রহিল না,—খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রারম্ভেই তাহাতে ভাঙন ধরিল। ফলে 'আদি ভারতীয় আর্য' বা বৈদিক ভাষা—'মধ্য ভারতীয়-আর্য' অবস্থায়, 'প্রাকৃত' ভাষায় রূপান্তরিত হইল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় বিভিন্ন ব্যঞ্জন-ধ্বনি পাশাপাশি অবস্থান করিত—ভাষায় নানা সংযুক্ত ব্যঞ্জন ছিল, মধ্য যুগের ভাষায়—প্রাকৃতে—সেগুলিকে সরল করিয়া লওয়া হইল, দুই বা ততোধিক বিভিন্ন ব্যঞ্জন মিলিয়া দ্বিত্ব বা দীর্ঘ ভাবে উচ্চারিত একটী ব্যঞ্জনে পরিবর্তিত হইয়া গেল। যেমন 'ধর্ম বা ধর্ম্ম' স্থলে 'ধম্ম বা ধম', 'ভক্ত' স্থলে 'ভত্ত', 'অষ্ট' স্থলে 'অট্ঠ' ইত্যাদি। সংযুক্তব্যঞ্জন-ধ্বনিদ্বয়ের মধ্যে একটী আবার অপর একটীর প্রভাবে পড়িয়া নিজ প্রকৃতি পরিবর্তিত করিল, যথা, 'সত্য' স্থলে 'সচ্চ' (দন্ত্য-বর্ণ ত কারের তালব্য চ-তে পরিবর্তন) 'প্রশ্ন' স্থলে 'পণ্হ', 'ঊর্ধ্ব' স্থলে 'উদ্ধ' ইত্যাদি। এইপ্রকারের ব্যঞ্জন-ধ্বনির পরিবর্তন ভারতের আর্যভাষার দ্বিতীয় যুগের বা প্রাকৃতের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইল প্রাকৃত। প্রাকৃত আবার প্রদেশ ভেদে নানা প্রকারের হইত। প্রাকৃতের উদ্ভব হয় বুদ্ধদেবের পূর্বে—খ্রীষ্ট-পূর্ব ৮০০-৬০০ র দিকে। এই সুপ্রাচীন কালে মুখ্যতঃ তিন প্রকারের প্রাকৃতের উদ্ভব হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান হয়। এক—'উদীচ্য' প্রাকৃত, পশ্চিম ও উত্তর-পাঞ্জাব অঞ্চলে গান্ধার, কঠ, কেকয়, মদ্র প্রভৃতি জনপদে বলা হইত, দুই—'মধ্যদেশীয়' প্রাকৃত, পূর্ব-পাঞ্জাব ও গঙ্গা-যমুনার অন্তর্বেদির পশ্চিম খণ্ডে কুরু পঞ্চাল অঞ্চলে বলা হইত, তিন—'প্রাচ্য' প্রাকৃত, প্রয়াগ অযোধ্যা কাশী অঞ্চলে বলা হইত, এবং এই প্রাচ্য প্রাকৃত পরে বিদেহ বা উত্তর-বিহার প্রদেশে এবং মগধ বা দক্ষিণ-বিহার প্রদেশে প্রসৃত হয়, ও বিহার প্রদেশে দুই-একটী নূতন বৈশিষ্ট্য লাভ করে। এত প্রাচীন কালে অন্য প্রাকৃতের খবর আমরা পাই না, তবে সম্ভবতঃ অন্য প্রকারেরও প্রাকৃত ছিল।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতও বদলাইতে থাকে। 'উদীচ্য', 'মধ্যদেশীয়', 'প্রাচ্য'—এই তিন মূল বা প্রাচীন প্রাকৃত ভাঙ্গিয়া ক্রমে যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের কিছু পরে 'শৌরসেনী' ও 'মাহারাষ্ট্রী', 'অর্ধ-মাগধী', 'মাগধী', 'আবন্তী', 'দাক্ষিণাত্যা' প্রভৃতি নানা পরবর্তী কালের প্রাদেশিক প্রাকৃতের উদ্ভব হইল। এগুলির সাহিত্যিক রূপও দেখা দিল। এই সকল প্রাদেশিক প্রাকৃত আরও পরিবর্তিত হইয়া আজকালকার ভিন্ন ভিন্ন আর্যভাষায় নবীন রূপ ধারণ করে। এই ব্যাপার খ্রীষ্টাব্দ ৫০০-র পরে ও ১০০০-এর মধ্যে সংঘটিত হয়। প্রাকৃত ও আধুনিক আর্যভাষার মাঝামাঝি অবস্থাকে 'অপভ্রংশ' অবস্থা বলা হয়।

সংস্কৃত অথবা বৈদিক, প্রাকৃত—খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগের প্রাচীন প্রাকৃত, ও খ্রীষ্ট-পর যুগের প্রাকৃত, তৎপরে অপভ্রংশ, এবং তাহার পরিবর্তনে আধুনিক ভাষা ;—ইহাই হইতেছে বাঙ্গালা, উড়িয়া, মৈথিলী, কোসলী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, হিন্দ্কী, সিন্ধী, গুজরাটী, মারহাট্টী, নেপালী প্রভৃতি আধুনিক আর্যভাষার উৎপত্তির ইতিহাসের ধারা।

নিম্নে প্রদত্ত কতকগুলি উদাহরণ হইতে এই ধারাটী বুঝা যাইবে। এই সকল পরিবর্তন বিশেষ কতকগুলি নিয়ম ধরিয়া ঘটিয়াছিল—অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বা খামখেয়ালী রূপে হয় নাই—এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

সংস্কৃত	প্রাচীন প্রাকৃত	পরবর্তী প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাঙ্গালা	আধুনিক বাঙ্গালা
অদ্য (*অদ্যম্)	অজ্জ, অজ্জিং	অজ্জিং	অজ্জি	আজি	আইজ্, আ'জ, আজ্
অধস্তাৎ, *অধিস্তাৎ	*অধিট্ঠা, অহেট্ঠা	হেট্ঠা, হেট্টা	হেট্ট	হেট	হেঁট্
অপর	অপর	অবর	অবর, অমর	আমর	আর্
অপস্মরতি	পস্সরতি	পস্সরদি, পস্সরই	পস্সরই	পাসরই	পাসরে
অলক্ত-	অলত্ত-	অলত্ত	অলত্ত-	আলতা	আলতা
অবিধবা	অবিধবা	অবিহবা	অইহঅ	অইহঅ, আইহ, আইঅ, আয়া	এয়ো
অবিধবত্ব	অবিহবত্ত	অবিহবত্ত	আইহঅত্ত	আইহঅত	আয়াৎ, এয়োৎ
অশীতি	অসীতি	অসীতি, অসীই	অসীই	আসী, আশী	আশী
অষ্টাদশ	অট্ঠাদস, *অট্ঠারহ	অট্ঠারহ	অট্ঠারহ	আঠারহ	আঠারো
অস্মে	অম্হে	অম্হে	অম্হি	আম্হি	আমি, -আম্
আদিত্য	আদিচ্চ	আইচ্চ	আইচ্চ	*আইচ	আইচ্ (পদবী)
আম্রাতক	*অম্বাতক, অম্বাডক	অম্বাডঅ	অম্বাডঅ	অম্বাডা	আম্ড়া

সংস্কৃত	প্রাচীন প্রাকৃত	পরবর্তী প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাঙ্গালা	আধুনিক বাঙ্গালা
আবিশতি	আবিশদি	আবিশই	আবিশই	আইশই	আইসে, আসে
ইন্দাগার-	ইন্দাগার-	ইন্দাআর-	ইন্দার-	ইন্দারা	ইঁদারা, ইঁদেরা
কথয়তি	কথেত্তি, কথেদি	কহেই	কহেই, কহই	কহই, কহএ	কহে, কয়্
কর্ণ	কন্ন	কন্ন	কন্ন	কান	কান্
কর্ণপত্রিকা	কন্নপত্তিকা	কন্নবত্তিআ	কন্নবট্টিঅ	*কনঅটী	কনটী, কটী
কীদৃশ, কীদৃশন-, *কাদৃশন-	*কাদিসন-	*কাইসন-, কইসন-	কইসণ-	কৈসন, কেহেন, কেহ্ন	কেন (= ক্যানো)
কৃষ্ণ = *ক্রষ্ণ	*কহ্ণ, কণ্হ	কণ্হ	কণ্হ	কান্হ	কান, কানু, কানাই
কেতক-	কেতক-	কেদগ-, কেঅঅ-	কেঅঅ-	কেআ	কেয়া
*কেতকট-	কেতকট-	কেদগড-, কেঅঅড-	কেঅঅড-	কেআড়া	কেওড়া
খাদতি	খাদতি, খাদদি	খাঅই	খাই	খাই	খায়্
গত + -ইল-	গত, গদ + ইল্ল-	গঅ ইল্ল-	গইল্ল-	গৈল, গেল	গেল (= গ্যালো)
গর্দভ-	গদ্দভ-	গদ্দহ-	গদ্দহ-	গাদহ-	গাধা
গৃহিণী	ঘরিণী	ঘরিণী	*ঘরিণি-	ঘরিণী	ঘরনী
গোমিক	গোমিক	গোমিগ, গোমিঅ	গোমিঁঅ	*গোঁই	গুঁই (পদবী)
গোরূপ	গোরূপ	গোরূব	গোরূঅ	*গোরু	গোরু

সংস্কৃত	প্রাচীন প্রাকৃত	পরবর্তী প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাঙ্গালা	আধুনিক বাঙ্গালা
গ্রাম	গাম	গাম	গাৱঁ	গাৱঁ	গাঁও, গাঁ
ঘাত	ঘাত	ঘাদ, ঘাঅ	ঘাৱ	ঘাৱ, ঘাঅ	ঘাও, ঘা
চন্দ্র	চন্দ	চন্দ	চন্দ	চান্দ	চাঁদ
জ্যেষ্ঠতাত	জেট্ঠতাত, জেট্ঠদাদ	জেট্ঠআঅ	জেট্ঠাঅ	জেঠা	জেঠা (জ্যাঠা)
তন্ত্র	তন্ত	তন্ত	তন্ত	তান্ত	তাঁত
তাম্র-, *তাম্ব-	তম্ব-	তম্ব-	তম্ব-	তাম্বা	তাঁবা, তামা
ত্রীণি	*তীর্ণি, তিণ্ণি	তিণ্ণি	তিণ্ণি	তীনি	তিন্
দলপতি	দলপতি, দলবদি	দলবই	দলবই	দলঅই	দলই, দলুই (পদবী)
দীপবর্তিকা	দীপবট্টিকা	দীববট্টিআ	দীবঅট্টিঅ	দীঅটী	দেউটী
দীপবৃক্ষ-	দীপরুক্খ-	দীবরুক্খ-	দীঅরুক্খ-	দিঅরুখা	*দিঅউরখা, দেউর্খা, দের্খো
দেবগৃহ-	দেবঘর-	দেবহর-	দেঅহর-	দেহরা	দেহরা
নবনীত	নবনীত, নবণীদ	নবণীঅ	নবণীঅ	নঅণী	ননী
পাটলি, পাটলিকা	পাটলি, -লিকা	পাডলি, পাডলিআ	পাডলিঅ	পারলী, পারলি	পারুল্
প্রবিশতি	পবিসতি, পবিসদি	পবিসই	পইসই	পইসই	পৈশে, পশে
ব্রাহ্মণ	বম্হণ, বম্ভণ, বম্হণ	বম্হণ	বম্হণ	বাম্হণ	বামন্, বামুন্

সংস্কৃত	প্রাচীন প্রাকৃত	পরবর্তী প্রাকৃত	অপভ্রংশ	প্রাচীন বাঙ্গালা	আধুনিক বাঙ্গালা
মহ্যা	মহ্য	মএ	মই, মই	মই	মুই
মৃত-	মট-	মড-	মড-	মড়া	মড়া
যাতি = যাতি	যাতি, যাদি	জাই	জাই	জাই, জাএ	জায় (= যায়)
বাধিকা	বাধিকা, বাধিগা	বাহিআ	বাহিঅ	বাহী	বাই
বন্যা	বণ্ণ্আ, বন্না	বন্না	বন্ন	বান	বান্
শুষ্ক-	সুক্খ-	সুক্খ-	সুক্খ-	সুখা, সুখা	শুখা, শুকো
শৃণোতি	সুণোতি, সুণদি	সুণই	সুণই	শুণই	শুনে, শোনে
সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সঞ্ঝা	সঞ্ঝ	সাঞ্ঝ	সাঁঝ্
সপত্নী	সপত্তী	সবত্তী	সবত্তি	সবতি, সঅতি	সৎ (সৎ-মা)
সমর্পয়তি	সমপ্পেতি, সমপ্পেদি	সমপ্পেই	সবঁপ্পেই	সঁঅপই	সঁপে
সংক্রম	সংকম	সংকম	সংকব	সাকব	সাঁকো
সামন্তরাজ	সামন্তরাজ	সামন্তরাঅ	সাবঁতরাঅ	সাবঁতরা	সাঁতরা (পদবী)
হস্ত	হত্থ	হত্থ	হত্থ	হাথ	হাত্

বাঙ্গালা প্রভৃতি নব্য বা আধুনিক আর্যভাষাগুলির সমস্ত বিশিষ্ট বা নিজস্ব শব্দ এই ভাবে আদি-আর্যভাষা বা প্রাচীন সংস্কৃত হইতে মধ্য-আর্যভাষা বা প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আসিয়াছে।

সংস্কৃতের (বৈদিকের) ব্যাকরণে যে সকল প্রত্যয় বিভক্তি ইত্যাদি ছিল সেগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রাকৃতের ভিতর দিয়া বদলাইয়া বাঙ্গালা প্রত্যয়াদিতে পরিণত হইয়াছে। যেমন সংস্কৃতের 'হস্তেন,' প্রাকৃতে হইল 'হত্থেণ', অপভ্রংশে 'হত্থে', প্রাচীন বাঙ্গালায় 'হাথেঁ', তাহা হইতে আধুনিক বাঙ্গালায় 'হাতে' ;—তৃতীয়ার '-এন' প্রত্যয় হইল '-এণ', ও পরে বাঙ্গালায় '-এ'-তে ইহার পরিণতি। সংস্কৃতে 'চলিতব্য', প্রাকৃতে হইল 'চলিঅব্ব', পরে 'চলিঅব্ব', শেষে বাঙ্গালায় 'চলিব' ,—সংস্কৃতের '-তব্য', বা '-ইতব্য' প্রত্যয় বাঙ্গালায় হইয়া গেল '-ইব', ভবিষ্যদ্‌বাচক প্রত্যয়। আবার বহু সংস্কৃত প্রত্যয় প্রাকৃতে বা প্রাচীন বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রাকৃতে ও প্রাচীন বাঙ্গালায় কতকগুলি নূতন প্রত্যয়ের উদ্ভব হইয়াছে। যেমন—সংস্কৃত 'চন্দ্রস্য'—প্রাকৃতে 'চন্দস্স' ; প্রাকৃতে আবার এই ষষ্ঠী বিভক্তি '-স্য' > -স্স'-কে সুপরিস্ফুট করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি শব্দ উপরন্তু যোগ করা হইত, 'চন্দ্রস্য—চন্দ্রাণাম্', প্রাকৃতে 'চন্দস্স—চন্দাণং', তৎপরে 'কের' বা 'কর' শব্দ-যোগে 'চন্দস্স কের, চন্দস্স কর—চন্দাণং কের, চন্দাণং কর।' পরে 'কর' বা 'কের' প্রভৃতি শব্দ, '-স্স' বিভক্তিকে অনাবশ্যক ও অপ্রচলিত করিয়া দেয়—ষষ্ঠীর রূপ হয় 'চন্দকের, চন্দকর' ; 'কের, কর' শব্দ সম্বন্ধ-বাচক প্রত্যয়ের স্থান গ্রহণ করে 'কের', 'কর'—এই বিভক্তিস্থানীয় শব্দের '-ক-', পদের অভ্যন্তরে থাকার ফলে লোপ পায়, এবং 'চন্দকের, চন্দকর' স্থলে 'চন্দএর, চন্দঅর' রূপের উদ্ভব হয়, ও পরে ইহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় 'চান্দের, চান্দর', আধুনিক বাঙ্গালায় 'চাঁদের, (প্রাদেশিক) চাঁদর', তুলনীয় উড়িয়া একবচনে 'চান্দর' < 'চন্দ কর', বহুবচনে 'চান্দিকর' < 'চন্দাণং-কর'। এইরূপে সংস্কৃত 'স্য' প্রত্যয়ের বিলোপের পরে, সংস্কৃত 'কার্য' শব্দ হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত 'কের' শব্দ, ও সংস্কৃত 'কর' শব্দ, ষষ্ঠীবাচক প্রত্যয় হইয়া দাঁড়ায়, এবং

ইহাদের বিকারে বাঙ্গালার ষষ্ঠীবাচক প্রত্যয় '-এর, -অর'-র উদ্ভব। সংস্কৃতের ব্যাকরণে বাঙ্গালা '-এর, -অর' প্রত্যয়ের অনুরূপ কিছুই মিলে না,—ইহা প্রাকৃতের নবীন সৃষ্টি। প্রাচীন আর্যভাষার কিছু অংশ রহিয়া গেল, প্রাকৃত যুগে এবং পরে কিছু নূতন বস্তুর সৃষ্টি হইল—এই ভাবে বৈদিক যুগের আর্যদের ভাষার ক্রমিক বিকাশের ফলে, বাঙ্গালা হিন্দী পাঞ্জাবী গুজরাটী মারহাট্টী নেপালী প্রভৃতির উৎপত্তি।

ভারতের প্রাচীন আর্যভাষার পরিবর্তনে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু আদি-আর্যভাষার বিকার-জাত হইলেও, বাঙ্গালায় ও আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় এমন কতকগুলি বাক্য বা পদ-সাধন রীতি পাওয়া যায়, যাহা আর্যভাষায়, অর্থাৎ বৈদিকে বা সংস্কৃতে, মিলে না। এইরূপ রীতি অনার্য-ভাষার প্রভাবের ফল বলিয়া অনুমিত হয়—কারণ কোল (অস্ট্রিক) ও দ্রাবিড় শ্রেণীর অনার্যভাষায় এই সব রীতি বিদ্যমান, এবং সংস্কৃতের স্বগোত্রীয় ভারতের বাহিরের অন্য আর্যভাষায় এগুলি পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়—'অনুকার-শব্দ' গুলি; বাঙ্গালা 'জল-টল, ঘোড়া-টোড়া, দেশ-টেশ, সে আমার বৈঠকখানায় বসে-টসে, তুমি একটু দেখ্‌বে-টেখ্‌বে', ইত্যাদি; মূল শব্দটীর প্রথম অক্ষরের ব্যঞ্জনধ্বনির স্থলে ট-কার বা অন্য ব্যঞ্জনধ্বনি বসাইয়া, 'ইত্যাদি' অর্থে মূল শব্দের সহিত সংযোগ করিয়া যে পদ-সাধন-রীতি, তাহা সংস্কৃতে ও ভারতের বাহিরের আর্য ভাষায় মিলে না; অথচ ভারতের অনার্যভাষাগুলির ইহা একটী লক্ষণীয় বিশিষ্টতা। বাঙ্গালা ভাষার সহকারী ক্রিয়াও অনার্যভাষার (বিশেষতঃ দ্রাবিড়ের) অনুরূপ—সংস্কৃতে ইহা অজ্ঞাত, যেমন, সংস্কৃতে 'সদ্' ধাতু অর্থে 'বসা', 'নি+সদ্'='বসিয়া পড়া'; 'বসা' ও 'পড়া' উভয় ধাতুর প্রতিরূপ মিলাইয়া ঠিক 'বসিয়া পড়া'-র মত সহকারী ক্রিয়ার রেওয়াজ সংস্কৃতে নাই; অথচ বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় এগুলি বিশেষভাবে বিদ্যমান, এবং অনার্যভাষাতেও এই প্রকার ক্রিয়া খুবই মিলে; যেমন, 'খাওয়া'—'খাইয়া ফেলা', 'দেওয়া'—'দিয়া বসা'; 'মারা'—'মারিয়া ফেলা', 'মরা'—'মরিয়া পড়া'; ইত্যাদি। এইরূপ স্থলে সহকারী ক্রিয়ার

যোগে মূল ক্রিয়ার অর্থের পরিবর্তন, বা প্রসার, অথবা সংকোচ ঘটে। এই প্রকারের আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলিকে বাঙ্গালা-ভাষা জন্মগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অনার্যভাষার নিকট হইতে পাইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষা যাহা পাইয়াছে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষার ভিত্তি। আদি ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক কথ্য ভাষা) কথাবার্তায় অপ্রচলিত হইয়া গেলেও, তাহার পরবর্তী কালের সাহিত্যিক রূপ যে সংস্কৃত ভাষা, সেই সংস্কৃতের চর্চা কখনও লোপ পায় নাই। পণ্ডিতেরা বরাবরই সংস্কৃতে বই লিখিয়া আসিয়াছেন। এই সাহিত্যের সংস্কৃত হইতে আবশ্যক-মত প্রাকৃতে এবং আধুনিক ভাষায় শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং হইতেছে। এইরূপ সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় অসংখ্য। সাধারণ দৈনিক জীবনের উপযোগী অধিকাংশ সরল ভাব-দ্যোতক শব্দ প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে। এইরূপ প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত উপাদান বা শব্দাবলীকে 'প্রাকৃত-জ' বা 'তদ্ভব' উপাদান বলে। ('তদ' অর্থাৎ 'তাহা', অর্থাৎ 'সংস্কৃত',—'তদ্‌ভব' অর্থাৎ কিনা 'যাহা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত')। পূর্বে এরূপ প্রাকৃত-জ শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। আর সংস্কৃত হইতে যে সব শব্দ লওয়া হইয়াছে, সেগুলি 'প্রাকৃত-জ' নয়, সেগুলি বাঙ্গালা ভাষায় 'ধার করা সংস্কৃত শব্দ'। সরাসরি সংস্কৃত হইতে আগত এই সব শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় দুই রকমে পাওয়া যায়, হয় এগুলিতে বিশেষ কোনও পরিবর্তন আসে নাই—যেমন 'কৃষ্ণ, চন্দ্র, গৃহিণী, নিমন্ত্রণ'—নয় এগুলির উচ্চারণে পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছে এবং বানানেও সেই পরিবর্তন ধরা হইয়াছে—যেমন 'কেষ্ট, চন্দর, গিন্নী, নেমন্তন্ন'। এইরূপ সংস্কৃত শব্দ অবিকৃত থাকিলে তাহাকে 'তৎসম' বলে, ('তদ্‌' অর্থাৎ 'তাহা' বা 'সংস্কৃত'—'তৎসম' অর্থাৎ 'যাহা সংস্কৃতের সমান'), এবং বিকৃত হইয়া গেলে তাহাকে 'ভগ্ন-তৎসম বা অর্ধ-তৎসম' বলে।

অতএব সংস্কৃতের শব্দ বাঙ্গালায় এই তিন রূপে পাওয়া যায়—

১ প্রাচীন কথিত সংস্কৃতের (আদি ভারতীয় আর্যভাষার) শব্দ, যাহা প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আসিয়াছে—প্রাকৃত-জ বা তদ্ভব শব্দ।

২ ক)। সাহিত্যের সংস্কৃতের নিকট হইতে গৃহীত শব্দ, যাহা অবিকৃতরূপে পাওয়া যায়—তৎসম শব্দ।

২ (খ) সাহিত্যের সংস্কৃতের নিকট হইতে গৃহীত শব্দ, যাহা বিকৃতরূপে পাওয়া যায়—ভগ্ন-তৎসম বা অর্ধ-তৎসম শব্দ।

সংস্কৃত বা আর্যভাষার শব্দ ভিন্ন, বাঙ্গালায় অন্য প্রকারের শব্দও আছে আর্যভাষার প্রচারের পূর্বে উত্তর ভারতে অনার্যভাষা প্রচলিত ছিল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে এই অনার্যভাষা দুইটী শ্রেণীতে পড়ে—কোল (অস্ট্রিক), এবং দ্রাবিড়। কোল এবং দ্রাবিড় যাহারা বলিত, তাহারা নিজ নিজ ভাষা ত্যাগ করিয়া আর্যভাষা গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাদের ভাষার কতকগুলি শব্দ আর্যভাষায় আসিয়া যায়। এইরূপ অনার্য শব্দ প্রাকৃতে পাওয়া যায়, আবার প্রাকৃতের পথ দিয়া সংস্কৃতের মধ্যেও কতকগুলি প্রবিষ্ট হয়। বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক আর্যভাষাতেও বিস্তর অনার্য শব্দ মিলে। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা প্রভৃতির অনার্য শব্দগুলিকে 'দেশী' নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। বাঙ্গালা ভাষায় আগত এইরূপ দেশী শব্দ—'চাউল, তেঁতুল, লাঠি, ঢেঁকি, ডাগর, বাদুড়, কুকুর, গাড়ী, ঘোড়া', প্রভৃতি, ইহাদের কতকগুলির প্রতিরূপ শব্দ আবার সংস্কৃতেও পাওয়া যায়। উত্তর-ভারতে প্রাচীন কালে প্রচলিত অনার্যভাষাগুলির উচ্ছেদ হওয়ায়, এই সমস্ত অনার্য শব্দের মূল রূপ এখন লুপ্ত—তবে ভাষাতত্ত্ব-বিদ্যার প্রয়াসের ফলে সেগুলির উদ্ধার হওয়া সম্ভব

ভারতের আর্যভাষার (প্রাচীনকালের সংস্কৃত হইতে জাত, এবং পরবর্তী যুগে সংস্কৃত হইতে ধার করা) শব্দ এবং অনার্য (দেশী) শব্দ ব্যতীত, বিদেশী ভাষার বহু শব্দও বাঙ্গালায় আসিয়াছে। প্রাচীনকালে পারসীকেরা এবং গ্রীকেরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ জয় করিয়াছিল, ভারতের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিয়াছিল। ইহাদের ভাষার কতকগুলি শব্দ প্রাচীন ভারতের কথা ভাষা প্রাকৃতে গৃহীত হয়, এবং তাহা হইতে দুই দশটা শব্দ সংস্কৃতেও যায়; এইরূপ কতকগুলি বিদেশী শব্দ— প্রাচীন পারসীক এবং গ্রীক—প্রাকৃতের নিকট হইতে বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভাষাও পাইয়াছে, যেমন, গ্রীক

drakhmē 'দ্রাখ্‌মে' শব্দ—অর্থ, 'একপ্রকার মুদ্রা', ইহা প্রাচীন ভারতে 'দ্রম্য'-রূপে গৃহীত হইল, পরে 'দ্রম্য' হইতে 'দম্ম', এবং 'দম্ম' হইতে বাঙ্গালা ও হিন্দী 'দাম' শব্দের উৎপত্তি, যাহার অর্থ 'মূল্য'। গ্রীক gōnos হইতে সংস্কৃত 'কোণ', গ্রীক kentron হইতে সংস্কৃত 'কেন্দ্র' (বাঙ্গালায় ইহার তদ্ভব রূপ এখন অপ্রচলিত)। তদ্রূপ প্রাচীন পারসীক post 'পোস্ত্' শব্দ, যাহার অর্থ '(লিখিবার জন্য প্রস্তুত) চামড়া'; ভারতে এই শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হইল 'পুস্তক, পুস্তিকা' রূপে, ইহা প্রাকৃতে দাঁড়াইল 'পোত্থঅ, পোত্থিআ', এবং তাহা হইতে বাঙ্গালায় 'পোথা', 'পুঁথি', 'পুথি'। প্রাচীন পারসীক mocak 'মোচক' শব্দের অর্থ 'হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার জুতা', প্রাচীন ভারতে এই শব্দ গৃহীত হয়, এবং যে 'মোচক' প্রস্তুত করে, সে 'মোচিক' নামে পরিজ্ঞাত হয়, এই 'মোচিক' হইতে 'চর্মকার' অর্থে আধুনিক 'মোচী, মুচি'। আবার পারস্যে mocak 'মোচক' পরবর্তী কালে mozah 'মোজহ্, মোজা' রূপে পরিবর্তিত হয়, ও ভারতে 'মোজা'-রূপে পুনরায় গৃহীত হয়। প্রাকৃতের মধ্য দিয়া এইরূপ দুই চারিটা বিদেশী শব্দ বাঙ্গালাতে আসিয়াছে বটে—কিন্তু বাঙ্গালা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় বেশী করিয়া বিদেশী শব্দের আমদানী আরম্ভ হইল তুর্কী-বিজয়ের পর হইতে। মোটামুটি ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম হইতে আগত মুসলমানধর্মাবলম্বী তুর্কেরা আসিয়া বাঙ্গালাদেশে লুট-তরাজ ও উপদ্রব আরম্ভ করিল, ক্রমে ত্রয়োদশ শতকে তাহারা বাঙ্গালাদেশ জয় করিল। তুর্কেরা ঘরে তুর্কী বলিত, কিন্তু সাহিত্যে ও রাজকার্যে ফারসী ভাষা ব্যবহার করিত, তাহাদের আনীত ফারসী ভাষা বাঙ্গালা দেশেও ব্যবহৃত হইতে লাগিল। রাজার ভাষা বলিয়া, ফারসী ভাষার প্রভাব বাঙ্গালা ভাষার উপর নানা দিক্ দিয়া পড়িল, এবং বহু ফারসী শব্দ ধীরে ধীরে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিল। বিশেষ করিয়া মোগল আমলে, ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতে, বাঙ্গালায় ফারসী শব্দ বহুল পরিমাণে আসিতে থাকে। ফারসী ভাষা আরবী শব্দে ভরপুর; ফারসীর মধ্যে যে সব আরবী শব্দ আছে, সেগুলিও প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালায় ঢুকিল। তদ্রূপ কতকগুলি তুর্কী শব্দও

ফারসীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় আড়াই হাজারের উপর ফারসী শব্দ প্রচলিত আছে। বাঙ্গালায় ফারসী (অর্থাৎ মূল ফারসী, এবং আরবী ও তুর্কী হইতে গৃহীত) শব্দের উদাহরণ—

১ রাজ-দরবার, লড়াই, এবং শিকার-বিষয়ক শব্দ, যথা—'আমীর, ওমরা, উজীর, খেতাব, খেলাৎ, তক্ত, তাজ, নকীব, মীর্জা, মালিক, হুজুর; কুচ-কাওয়াজ, জখম, তাম্বু, তোপ, ফৌজ, বন্দুক, বারুদ, বাজ, বাহাদুর, বখ্‌শী, রসদ, শিকার'; ইত্যাদি

২ রাজস্ব, শাসন ও আইন-আদালত-সংক্রান্ত শব্দ—'আদম-শুমারী, আবাদ, এক্তিয়ার, খাজনা, কব্জা, খাজনা, গোমস্তা, তালুক, দারোগা, দপ্তর, নাজির, পেয়াদা, বীমা, মাফ, মোহর, রাইয়ত, সরকার, হদ্দ, হিসাব, অজু, আইন, উকীল, এজাহার, ওজর, দরখাস্ত, দলীল, নাবালক, নালিশ, ফরিয়াদী, ফেরার, গ্রেপ্তার, মোকদ্দমা, শনাক্ত, সালিস, সেরেস্তা, হলফ, হাকিম, হুকুম, হেফাজৎ'; ইত্যাদি।

৩ মুসলমান ধর্ম-সংক্রান্ত শব্দ—'অজু, আউলিয়া, আল্লা, ঈমান, ঈদ, কবর, কাফের, কাবা, গাজী, জুম্মা, তোবা, দর্‌গা, মোল্লা, নবী, নমাজ, মস্‌জিদ, মহরম, মুর্‌শিদ, শরিয়ত্, শহীদ, শিয়া, সুন্নী, হদীস, হুরী'; ইত্যাদি।

৪। মানসিক সংস্কৃতি-সংক্রান্ত শব্দ—'আদব, আলেম, এলেম, কেচ্ছা, খত্, গজল, তর্‌জমা, মক্তব, বয়েৎ, সেতার, হরফ, সরম (=শর্‌ম্), ইজ্জৎ', ইত্যাদি।

৫ বাস্তব সভ্যতা, ব্যবসায়, শিল্প-কলা, বিলাস-দ্রব্য-সংক্রান্ত শব্দ—'আতর, আয়না, আঙ্গুর, আতর, আতশবাজী, আবরু, কাগজ, কাবাব, কালিয়া, কুলুপ, কিংখাব, কোর্মা, কাচী, খাতা, খান্‌সামা, খাস্তা, গজ, গোলাপ, চর্‌খা, চশ্‌মা, চাবুক, ছবি, জামা, জিন, তহবিল্, তাকিয়া, দালান, দূরবীন, দোয়াৎ, পাজামা, পোলাও, ফানুস, বরফী, বাগিচা, বুল্‌বুল, মখমল, মলম, মালাই, মিছরী, মীনা, মুহুরী, রিফু, রুমাল, লাগাম, সানকী, শরবৎ, শাল, শিশি, সোরাই, হাউই, হালুয়া, হাওদা, হুঁকা'; ইত্যাদি।

৬। বিদেশী জাতির নাম—'আরব, আরমানী, ইহুদী, ইউনানী, কাফ্রী, হাবশী, ফিরিঙ্গি, ইংরেজ' ; ইত্যাদি।

৭। সাধারণ বস্তু- বা ভাব-বাচক শব্দ—'অন্দর, আওয়াজ, আব-হাওয়া, আসল, কলম, কম, কোমর, খবর, খোরাক, গরজ, গরম, চাদা, চাকর, জলদি, জানোয়ার, জাহাজ, তাজা, দখল, দরকার, দম, দাগ, দানা, দোকান, নগদ, নেশা, পছন্দ, পরী, বজ্জাত্‌, বোঁচ্‌কা, মজবুত্‌, মির্যা, মোরগ, মুলুক, রোশ্‌নাই, সাহেব, সোবে, হুকুম, হাওয়া, হাজার, হাল, হুজুগ' ; ইত্যাদি।

ফারসী শব্দের পরে বাঙ্গালা ভাষায় 'ফিরাঙ্গী' বা পোর্তুগীস শব্দের প্রবেশ হয়, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে। ঐ সময়ে পোর্তুগীস বণিকেরা বাঙ্গালা-দেশে প্রথম আসে, এবং বাঙ্গালাদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে পোর্তুগীসদের প্রভাব বিশেষ প্রবল থাকে। পোর্তুগীসেরা নানা নূতন বস্তু বঙ্গদেশে আনয়ন করে, এই সকলের নাম পোর্তুগীস হইতে বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হয়। বাঙ্গালায় এক শতের কিছু অধিক পোর্তুগীস শব্দ আছে। দৃষ্টান্ত—'আনারস, তামাক, গরাদিয়া, চাবি, জোয়ালিয়া, বাস্‌তি, ইস্ত্রি, কামরা, গুদাম, পাউ(-রুটী), নীলাম, গির্জা, ক্রুশ, যীশু, পেয়ারা, পেঁপে, কপি, বোতল, বোতাম, তুতি', ইত্যাদি।

বাঙ্গালাদেশে ফরাসী ও ওলন্দাজেরাও আসে, ইহাদের ভাষার দুই চারিটা শব্দ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। খেলায় তাসের রঙের নামের মধ্যে তিনটী নাম ওলন্দাজ ভাষার—'হরতন, রুইতন, ইস্কাবন' ('চিঁড়িতন' বা 'চিঁড়িয়া' ভারতীয় শব্দ); 'ব্রুপ' বা 'তুরুপ', 'বোম' (ঘোড়ার গাড়ীর) ও 'পিস্‌পাস্‌' (ভাতে-মাংসে একত্র পাক-করা খাদ্য) ওলন্দাজ শব্দ। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে ইংরেজেরা বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রবল হয় এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজেরা বাঙ্গালাদেশের রাজা হইয়া বসিল। ইউরোপের সভ্যতা ও জ্ঞান ইংরেজীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালীদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে—ফলে, জীবনের প্রায় সব দিকেই ইংরেজী ভাষার ছাপ বাঙ্গালা ভাষায় পড়িতে আরম্ভ করে। এখন যত দিন যাইতেছে, এই প্রভাব বাঁঙ্গালা ভাষার উপরে ততই বেশী শক্তিশালী হইয়া কার্য করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা শত শত

ইংরেজী শব্দ গ্রহণ করিয়াছে এবং করিতেছে, ও ভবিষ্যতে আরও করিবে। বহু ইংরেজী শব্দ রূপ বদলাইয়া খাঁটী বাঙ্গালা শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যেমন 'লাট, কাব (সূতা), ইস্কুল, বেঞ্চি, ডাক্তার, হাসপাতাল, কৌন্সিল, আপিস, বগলস, ডিপটি, আপীল, গারদ, কাপ্তেন, টুল, টানি, টুনী, লিজবোট, লজঞ্জুস, সমন, হুমর, নেলাম' ইত্যাদি। বহু ইংরেজী শব্দ এখন কেবল সাহিত্যেই ব্যবহৃত হয়—যেমন, 'ট্র্যাজেডি, আর্ট, হিরোইন, ফোটোগ্রাফ্‌, রোমান্টিক' প্রভৃতি। বিশেষ ব্যবসায় বা শিল্প-সম্বন্ধীয় বহু শব্দ আবার মুখে মুখে চলে। মোটের উপর, বাঙ্গালীর জীবনে ইউরোপীয় ভাব ও ইউরোপীয় বস্তু যত আসিতেছে, ততই তাহার ভাষায় ইংরেজী শব্দেরও প্রসার বাড়িতেছে।

বাঙ্গালা ভাষা এক হাজার বৎসরের অধিক কাল হইল উদ্ভূত হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশে প্রাকৃতের পরিবর্তনে; ইহাতে ইহার নিজস্ব প্রাকৃতজ শব্দ আছে; বিশুদ্ধ ও বিকৃত সংস্কৃত শব্দ আছে; ইহাতে প্রাচীন যুগ হইতেই আগত দেশী বা অনার্য শব্দও কিছু কিছু আছে, এবং ইহাতে আগত বিদেশী ভাষা ফারসী, পোর্তুগীস ও ইংরেজী হইতে গৃহীত শব্দও কম নহে। বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবি ও অন্য লেখক লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের হাতে এই ভাষা অপূর্ব শক্তিযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষার আদি বা প্রাচীন যুগ, খ্রীষ্টাব্দ ১২০০ পর্যন্ত—মোটামুটি তুর্কীদের দ্বারা বঙ্গদেশ বিজয় পর্যন্ত; এই সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ। ভাষা এই যুগে সম্পূর্ণাঙ্গ হয় নাই, ইহা তখনও প্রাকৃতের ধরণ অনেকটা রক্ষা করিতেছে।

বাঙ্গালার মধ্য-যুগ ১২০০ হইতে ১৮০০ পর্যন্ত। এই যুগকে তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে: [ক] যুগান্তর কাল—১২০০ হইতে ১৩০০ পর্যন্ত। বাঙ্গালা ভাষাকে আমরা যে সাধু ভাষার রূপে এখন দেখিতে পাইতেছি, এই সময়ে ইহা সেই রূপটী পাইতেছিল। এই সময়ে সাহিত্য বা নিদর্শন বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। [খ] আদি মধ্য-যুগ, প্র-চৈতন্য বা চৈতন্য-পূর্ব যুগ—১৩০০ হইতে ১৫০০ পর্যন্ত। এই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাল

করিয়া পত্তন হয়, নানা বিষয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি আরম্ভ হয়। [গ] অন্ত্য মধ্য-যুগ—১৫০০ হইতে ১৮০০ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালায় বৈষ্ণব সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতির যুগ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক। এই মধ্য-যুগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চারণ ঘটিত কতকগুলি পরিবর্তন আসিয়া যায়, যাহার ফলে ভাষা ক্রমে ক্রমে প্রাচীন অবস্থা হইতে আধুনিক চলিত ভাষায় পরিবর্তিত হয়—যেমন 'রাখিয়া', এই প্রকারে প্রাচীন বাঙ্গালার রূপ, পরে 'রাইখিয়া', 'রাইখ্যা', 'রেইখ্যা,' 'রেখ্যে' প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই মধ্য-যুগের শেষে চলিত ভাষায় 'রেখে'-তে রূপান্তরিত হয়। সম্পূর্ণ শব্দ 'সাধুয়া' তদ্রূপ 'সেধো' রূপ গ্রহণ করিয়া বসে—'সাধুয়া'—সাউধুয়া—সাইধুয়—সেধো'। মধ্য-যুগের অবসানকালে বাঙ্গালা দেশে ইংরেজদের অধিষ্ঠান হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের যত্নে ও আগ্রহে বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপার প্রচলন হয়, এবং গদ্য-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

১৮০০ সালের পরে বাঙ্গালায় আধুনিক যুগের আরম্ভ। বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য অতি গৌরবময় আসনে উন্নীত হইয়াছে। ইউরোপীয় বা আধুনিক চিন্তার ধারাকে বাঙ্গালা ভাষা আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছে। নানা লক্ষণীয় পরিবর্তনের মধ্যে, কলিকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষাকে সাধুভাষার পার্শ্বে সাহিত্যের আসনে উন্নীত করা এই যুগের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বাঙ্গালা বর্ণমালা—আজকাল সাধারণতঃ দেবনাগরী বর্ণমালায় সংস্কৃত বই ছাপানো হয় বলিয়া অনেকের ধারণা যে দেবনাগরী-ই ভারতের প্রাচীনতম বর্ণমালা, এবং এই দেবনাগরী হইতে বাঙ্গালা বর্ণমালা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, বাঙ্গালা ও দেবনাগরী পরস্পর ভগিনী-সম্পর্কে সম্পর্কিত। দেবনাগরী হইতেছে গুজরাট ও রাজপুতানা এবং সংযুক্ত-প্রদেশের পশ্চিম খণ্ডের মধ্যে উদ্ভূত বর্ণমালা, গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত রাজাদের প্রভাবের ফলে সমগ্র উত্তর-ভারতে ও অন্যত্র ইহার প্রসার ঘটিয়াছে। ভারতের আর্যভাষার প্রাচীনতম বর্ণমালা পাওয়া যায়

খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকের অশোক-অনুশাসনে। এই বর্ণমালা বা লিপির নাম 'ব্রাহ্মী' লিপি। এই ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটী মতবাদ প্রচলিত আছে—[১] ফিনীশিয়া দেশের প্রাচীন বর্ণমালার আধারের উপরে ভারতের পণ্ডিতগণ কর্তৃক ব্রাহ্মী বর্ণমালা সৃষ্ট হয়, এবং [২] ব্রাহ্মী বর্ণমালা মূলে বিদেশীয় নহে, ইহা ভারতেই উদ্ভূত হয়—মোহেন্-জো-দড়ো ও হড়প্পায় আবিষ্কৃত মুদ্রা বা সীল মোহরে যে লিপি বিদ্যমান, তাহা প্রায় চারি হাজার বৎসরের প্রাচীন, কিন্তু সে লিপি এখনও পড়া যায় নাই, এবং খুব সম্ভব তাহা কোনও অনার্য ভাষার লিপি—আর্য ব্রাহ্মী লিপি তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে। ব্রাহ্মী লিপির গঠনপ্রণালী সরল, বর্ণগুলি মাত্রা-রেখা হীন। ব্রাহ্মী অক্ষর এই প্রকারের: 𑀅 = অ, 𑀓 = ক, 𑀔 = খ, Λ বা ∩ = গ, 𑀘 = চ, 𑀚 = জ, 𑀛 = ঝ, 𑀜 = ঞ, 𑀝 = ট, 𑀞 = ঠ, 𑀟 = ড, 𑀢 = ত, 𑀣 = থ, D বা O = দ, 𑀦 = ন, 𑀧 = প, □ = বর্গীয় ব, 𑀪 = ভ, । বা ' = র, 𑀮 = ল; ইত্যাদি।

ব্রাহ্মী অক্ষরগুলি দক্ষিণ-ভারতে একটী বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে, তাহা হইতে দক্ষিণ-ভারতের গ্রন্থ, মালয়ালম্, তামিল, তেলুগু-কানাড়ী প্রভৃতি বর্ণমালার উদ্ভব হয়।

ব্রাহ্মী লিপি হইতে উদ্ভূত কতকগুলি ভারতীয় লিপি খ্রীষ্ট জন্মের কয়েক শত বৎসর পূর্বে ও পরে ভারতের বাহিরে নীত হয়, এবং সেগুলি হইতে বৃহত্তর ভারতের নানা বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে, যথা—ব্রহ্মদেশের মঙ্ বা মোন্ বা তালৈঙ্ লিপি, এবং তজ্জাত ম্রনমা বা বর্মী লিপি, কম্বোজের কম্বোজ লিপি, ও তাহা হইতে উদ্ভূত থৈ বা থাই অর্থাৎ শ্যামী লিপি; প্রাচীন চম্পার লিপি; যবদ্বীপীয় লিপি, এবং দ্বীপময় ভারতের নানা লিপি, বোদ্ বা ভোট অর্থাৎ তিব্বতী লিপি; চীন, কোরিয়া ও জাপানে ব্যবহৃত সংস্কৃত লিপি; মধ্য আসিয়ার খোতান অঞ্চলের পূর্বী-ইরানী লিপি; কুচ-নগরীয় 'তুখার' লিপি; প্রভৃতি। এগুলি সমস্তই বাঙ্গালা লিপির জ্ঞাতি।

উত্তর-ভারতে ব্রাহ্মী লিপি, কুষাণ ও গুপ্ত রাজাদের আমলে পরিবর্তিত

হইয়া, কালক্রমে সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পরে, সপ্তম শতকে, তিনটী বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে—এই তিনটী রূপের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমে (কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে) প্রচলিত রূপের নাম 'শারদা', দক্ষিণ পশ্চিমে (রাজস্থান, মালব ও গুজরাটে) এবং মধ্য-দেশে প্রচলিত রূপের নাম 'নাগর', এবং পূর্ব-ভারতের রূপের নাম 'কুটিল'। মূল ব্রাহ্মী লিপির এই 'কুটিল' রূপ-ভেদ হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তি, 'নাগর' হইতে দেবনাগরীর, এবং 'শারদা' হইতে পাঞ্জাবের গুরুমুখীর উৎপত্তি। বাঙ্গালা ও দেবনাগরী লিপি পরস্পর হইতে স্বাধীন, এবং এই দুই লিপি মাত্র গত হাজার বছর হইল বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষা তাহার জন্মকাল হইতেই বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইয়া আসিতেছে,—অবশ্য এই বঙ্গাক্ষরের আদিম আকার আজকালকার বঙ্গাক্ষর হইতে কতকটা পৃথক্ ছিল, এবং সেই প্রাচীন রূপের বিকাশের ফল আধুনিক বঙ্গাক্ষর।

বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য বাঙ্গালাদেশের তথা ভারতবর্ষের একটী শ্রেষ্ঠ সম্পদ, এবং ইহা জগৎকে আধুনিক ভারতবর্ষের একটী লক্ষণীয় দান। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী এক ইংরেজ অধ্যাপক লিখিয়াছিলেন যে, সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে দুইটী মাত্র ভাষায় প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য মিলে,—সে দুইটী ভাষা হইতেছে ইংরেজী ও বাঙ্গালা। সংস্কৃত, পালি, তামিল, উত্তর-ভারতীয় ভাষাবলী ('হিন্দী') ও বাঙ্গালা—এই কয়টাই ভারতের বিশিষ্ট সাহিত্য-সম্পদ্ ধারণ করিয়া আছে। সংস্কৃত, গ্রীক, চীনা, আরবী, ফারসী, লাতীন, ফরাসী, ইংরেজী, জরমান প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের তুলনায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থান প্রথম শ্রেণীতে না হইলেও, আধুনিক সাহিত্য-জগতে ইহার আসন যথেষ্ট উচ্চে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যে গৌরব, তাহা মুখ্যতঃ তাহার নবীন সাহিত্যকে লইয়া—বিগত এক শত বৎসরের মধ্যে ইউরোপের সঙ্গে সংস্পর্শ ও সঙ্ঘাতের ফলে যাহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে লইয়া। বাঙ্গালা ভাষায় বেশ বড় একটী পুরাতন সাহিত্য আছে, গত হাজার বছরের অধিক ধরিয়া প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় সেই সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে; এবং তাহাতে কতকগুলি বড় বড় কবি উচ্চদরের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ, এবং তাঁহাদের সমসাময়িক ও অনুবর্তী লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষাকে যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিশেষভাবে লক্ষণীয়

বাঙ্গালা সাহিত্যের পূর্ব-কথা আলোচনা করিতে গেলে, দুইটী জিনিস আমাদের চোখে ঠেকে। প্রথম, লেখকদের সম্বন্ধে প্রায় কোনই খবর পাওয়া যায় না—বিশেষতঃ তাঁহাদের সময়ের সম্বন্ধে। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি পুরাতন বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবির সম্বন্ধে দুই চারিটী কিংবদন্তী,

এবং ক্বচিৎ বা দুই একটা ঐতিহাসিক নামের সঙ্গে তাঁহাদের সংযোগ—ইহা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু মিলে না। তারপর, আধুনিক যুগ অর্থাৎ বৃটিশ রাজত্বের পূর্বে, তাঁহারা ঠিক কি লিখিয়া গিয়াছেন তাহাও পাওয়া যায় না। তাঁহারা যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিজেদের হাতে লেখা বা তাঁহাদের জীবৎকালে লিখিত পুঁথিতে তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু কাগজ বা তালপাতার পুঁথি বেশী দিন টিকিত না, নূতন করিয়া নকল করিতে হইত। এই নকলের সময়ে ভ্রম-প্রমাদ ঢুকিত, বাদ-সাদ পড়িত,—অনুলেখক বা নকল-কার পুরাতন লেখা ভাল করিয়া পড়িতে না পারায়, বা পড়িয়া বুঝিতে না পারায়, লেখার কালে তাহার হাতে ভাষা ও শব্দ বদলাইয়া যাইত, এবং নকল-কার নিজে কবি হইলে, ও নিজের রচনা নিজেরই ভাল লাগিলে, তাহা প্রতিষ্ঠাবান্ কবির লেখা বলিয়া চালাইয়া দিতে পারিলে খুশী হইত। (তখনকার দিনে নিজের নামের চেয়ে নিজের লেখার প্রতি মমতা-বোধ বেশী করিয়া হইত বলিয়াই ইহা ঘটিত)। এখন নানা রকমে অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন কবিদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ বা জীবৎকাল নির্ধারণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাঁহারা ঠিক কি লিখিয়া গিয়াছেন, পাঁচখানা পুঁথি মিলাইয়া তাহা স্থির করিবার প্রয়াস হইতেছে। প্রাচীন বাঙ্গালার কবিদের আলোচনায় কবিদের নাম ও খ্যাতি, এবং তাঁহাদের লেখা বলিয়া প্রচলিত রচনার সমষ্টি—ইহা ছাড়া নিশ্চিত-তর কিছু সাধারণতঃ পাওয়া যায় না বলিয়া, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সার্থক আলোচনা, সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটা কঠিন বস্তু হইয়া আছে।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে আরও দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিবার—প্রথম, গদ্য-সাহিত্যের অভাব; এবং দ্বিতীয়, সাহিত্যে অল্প কয়েকটী বিষয় লইয়াই কারবার। চিঠি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ ভিন্ন অন্যত্র গদ্যের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়। ছাপাখানার যুগের পূর্বে গদ্যে লেখা দুই একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি নগণ্য; সমস্ত সাহিত্যটাই পদ্যে লেখা,—পয়ার,

ত্রিপদী প্রভৃতি মামুলী ছন্দে রচিত; কাব্য ও গান ছাড়া, জীবন-চরিত, বংশাবলী, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, দর্শন, চিকিৎসা—যাহা কিছু সম্বন্ধে বই লেখা হইয়াছে, সবই পদ্যে। (এই রীতি এখনও লুপ্ত হয় নাই—পদ্যে 'হোমিওপ্যাথি-দর্পণ' ও 'মোক্তার-সুহৃদ্' পুস্তকও বাঙ্গালায় রচিত হইয়াছে।) সাহিত্যে আলোচ্য বিষয়ের বৈচিত্র্যের অভাবটাও বড় চোখে লাগে। বেশীর ভাগ পাওয়া যায় গান ও কাব্য। গান—ধর্ম-বিষয়ক, এবং প্রেম-বিষয়ক; কাব্য—প্রাচীন সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণের কথা লইয়া, বাঙ্গালা দেশের পাত্র-পাত্রীদের কথা লইয়া, দেব-দেবীর কাহিনী লইয়া। প্রাচীন ভারতের অর্থাৎ সংস্কৃতে রচিত ইতিহাস-পুরাণ-কথা, ও মধ্য-যুগের গৌড়-বঙ্গীয় পুরাণ-কথা—মুখ্যতঃ ইহাই পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের উপজীব্য। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব সাহিত্যে জীবন-চরিত ও দার্শনিক আলোচনা-মূলক সাহিত্য দেখা দিল, এদিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা মস্ত অভাবের পূরণ হইল। ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি উচ্চ জাতির বংশ-পরিচয় লইয়া 'কুলশাস্ত্র' বা 'কুলজী' নামে অনেক বই লেখা হয়, কিন্তু সেগুলি সাহিত্য-পদ-বাচ্য নহে। ঐতিহাসিক কথা এবং দেশ বর্ণন অবলম্বন করিয়া দুই চারিখানি বই অষ্টাদশ শতকে লেখা হয় কিন্তু মোটের উপর, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল অতি অল্প—তিনটী চারিটী বিষয় লইয়া এই সাহিত্যের পুঁজি-পাটা ইহার তুলনায়, প্রাচীন হিন্দী বা তামিল সাহিত্যের প্রসার খুব বেশী, এবং সেই যুগের ফারসী, আরবী, ইতালীয়, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি পশ্চিমের ভাষাগুলির এবং চীনা ভাষার সাহিত্যের প্রসার ও বিষয়-বৈচিত্র্য আরও অনেক বেশী। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে 'একঘেয়ে' ভাবটা বড়ই প্রবল; সেই এক রামায়ণের সাত শত বিভিন্ন অনুবাদ, সেই এক লাউসেন-কাহিনী লইয়া পুরুষানুক্রমে কবিদের 'একঘেয়ে' ধর্মমঙ্গল কাব্য-রচনা, সেই নানা কবির হাতে চৌতিশা-স্তোত্র বা বারমাস্যার একই ভাবে বর্ণনা। এই 'একঘেয়ে' ভাব, আর কবিদের গতানুগতিকতা—

যেন বাঙ্গালা দেশের পাহাড়-পর্বতের অভাব-জনিত প্রাকৃতিক একঘেয়েমের—সেই মাঠের পর মাঠ, নদী, খাল, সমতল ক্ষেত্র, বাগান, গ্রাম, জঙ্গল লইয়া, বৈচিত্র্যহীন প্রাকৃতিক সংস্থানেরই সাহিত্যিক প্রতিবিম্ব। বিষয় এক, এবং রচনাতেও নূতনত্ব নাই—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। কিন্তু কোনও কোনও কবির প্রতিভা, তাঁহার সহৃদয়তা ও সূক্ষ্ম দর্শন-শক্তি, তাঁহার রসজ্ঞান ও কৌতুক- এবং হাস্য-রস-বোধ, তাঁহার ভাষার উপরে অধিকার ও ভাষা-প্রয়োগের শক্তি, এবং তাঁহার সত্যকার সৌন্দর্য-বোধ এই সবে মিলিয়া সাহিত্যে এই গতানুগতিকতা-জনিত এবং নবীনতার অভাব-জনিত মরুভূমির মধ্যেও উদ্যানের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের পত্তন হয়, মুসলমান ধর্মাবলম্বী তুর্কীদিগকর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্বেই -যে হিন্দু-যুগে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হয়, সেই হিন্দু-যুগেই। উত্তর-ভারতের ও বিহার-প্রদেশের মৌর্য রাজারা বাঙ্গালাদেশ বিজয় করিলেন, খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে। মৌর্য রাজাদের অধীনে আসিবার পূর্বে বাঙ্গালাদেশে আর্য-ভাষার প্রসার হয় নাই বলিয়া মনে হয়, দেশের লোকে কোল (অস্ট্রিক), দ্রাবিড় আর মোঙ্গোল শ্রেণীর অনার্য-ভাষা বলিত। মগধ বা বিহার প্রদেশ হইতে মাগধী-প্রাকৃত বাঙ্গালাদেশে আসিল এই প্রাকৃত এবং ইহার বিকারে জাত 'মাগধী-অপভ্রংশ' বাঙ্গালাদেশময় ছড়াইয়া পড়িল, দেশের অধিবাসীরা নিজেদের অনার্য-ভাষা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে এই আর্য-ভাষা গ্রহণ করিল। চীনা পরিব্রাজক Hiuen-Thsang হিউএন্-ৎসাঙ্ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম পাদে বঙ্গদেশে আসেন, তাঁহার বর্ণনা পাঠে মনে হয় যে তখন সমগ্র বাঙ্গালাদেশ আর্য-ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। মাগধী প্রাকৃত ভাষা বদলাইয়া বদল হইয়া, মাগধী-অপভ্রংশের মধ্য দিয়া, প্রাচীন গৌড়-বঙ্গ-ভাষার রূপ ধারণ করে। ঠিক কোন্ সময়ে প্রাকৃতের বিশেষত্বের পরিবর্তে বাঙ্গালার বিশেষত্ব আসিয়া যায়, তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায় না; তবে এখন হইতে এক হাজার বৎসর পূর্বে সে ব্যাপার ঘটিয়াছিল বলিয়া

অনুমান হয়,—তখন বাঙ্গালাদেশে পাল-বংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৭৪০-এর দিকে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং সাড়ে-তিন শত বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশ ও বিহার এই পাল-বংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। পরে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে বঙ্গদেশ সেন-বংশীয় রাজাদের অধিকারে আসে। সেন-বংশীয় রাজাদের সময়ে বঙ্গদেশ বিদেশী মুসলমান তুর্কীদের দ্বারা বিজিত হয়।

পাল-বংশীয় রাজারা ধর্মে বৌদ্ধ ছিলেন, সেন-বংশীয়েরা ছিলেন শৈব। তখনকার কালে ভারতে বৌদ্ধ- ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পার্থক্য বড় বেশী ছিল না। পাল-রাজাদের আমলে বাঙ্গালাদেশ শান্তি এবং সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয়, জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা দেশে বিস্তৃত হয়, বাঙ্গালাদেশের পণ্ডিতদের হাতে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দর্শন ও অনুষ্ঠান লইয়া সংস্কৃত ভাষায় একটী বড় সাহিত্য গড়িয়া উঠে, বিহার ও বাঙ্গালাদেশে ভাস্কর্য ও শিল্পের একটী অভিনব ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ-ভাষা বাঙ্গালার দিকে বৌদ্ধ ধর্মাচার্যগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়,—ইহারা বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধমতের আধ্যাত্মিক পদ রচনা করেন। অনুমান হয়, বৈষ্ণব ও শৈবেরাও এইরূপ পদ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেইরূপ পদের অস্তিত্ব আর নাই। বৌদ্ধ ধর্মাচার্যদের পদ বাঙ্গালাদেশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু নেপালে এইরূপ কতকগুলি পদ খুব অল্পসংখ্যক কতকগুলি প্রাচীন পুঁথিতে রক্ষিত হইয়াছিল—নেপালের বৌদ্ধ বিহারে স্থবিরদের মুখেও আরও এইরূপ পদ প্রচলিত আছে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯১৬ সালে এইরূপ একখানি পুঁথি ছাপাইয়া দিয়াছিলেন; ইহাতে ৪৭টী পদ বিকৃত এবং খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। পদগুলি হেঁয়ালীর ধরণে লেখা; বাহিরের অর্থ সরল, কিন্তু ভিতরের আধ্যাত্মিক অর্থ বোঝা কঠিন। একটী পদের নমুনা দিয়ে দেওয়া হইল—ইহার ভাষার বানান একটু-আধটু বদলানো হইয়াছে:—

কাহেঁ রে ঘেনি মেলি আছো কীস।
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীস ॥১॥

অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খণহি ন ছাড়ই ভুসুকু অহেরী ॥২॥
তিণ ন চুচ্ছই হরিণা—পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জাণী ॥৩॥
হরিণী বোলই—এ হরিণা, সুণ তো।
এ বণ ছাড়ি হোহু ভান্তো ॥৪॥
তরঙ্গন্তে হরিণার খুর ন দীসই।
ভুসুকু ভণই—মূঢ়া হিঅহি ন পইসই ॥৫॥

অর্থ—ওরে, কাহাকে লইয়া (=ঘেণি) ও কাহাকে ত্যাগ করিয়া (=মেলি), আছি আমি (=অচ্ছহুঁ) কিসে? চৌদিকে পরিবেষ্টিত (=বেঢ়িল=বেড়া) হাক (অর্থাৎ শিকারীদের শব্দ) পড়ে (অর্থাৎ শোনা যায়)। [১]। আপনার মাংসের জন্যই হরিণ [জগতের] বৈরী, শিকারী (=অহেরী) [বৌদ্ধগুরু] ভুসুকু এক ক্ষণও ছাড়ে না। [২]। হরিণ তৃণ ছোঁয় না, পানী পিয়ে না, হরিণের [এবং] হরিণীর নিলয় (=বাসভূমি) জানি না। [৩]। হরিণী বলে—'এই হরিণ, তুই শোন্, এ বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত (পলায়িত) হও।' [৪]। তীব্র যাইতে-যাইতে (=তুরঙ্গে) হরিণের খুর দেখা-যায় না। ভুসুকু [বৌদ্ধগুরু] বলে—মূঢ়ের হিয়ায় [এই পদের তাৎপর্য] পশে না। [৫]।

এইরূপ কতকগুলি প্রহেলিকাময় কবিতা লইয়া প্রাচীনতম বঙ্গীয় সাহিত্য। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন যুগে বাঙ্গালা ভাষায় আর কি ছিল, তাহা লইয়া জল্পনা-কল্পনা চলিতে পারে মাত্র,—যতক্ষণ না এই যুগের অন্য লেখা আবিষ্কৃত হইতেছে ততক্ষণ স্পষ্ট কিছু বলা সম্ভবপর নহে। তবে খুব সম্ভবতঃ এ যুগেও বৈষ্ণব এবং অন্য গীতি-কবিতা ছিল, এবং পরবর্তী কালের মঙ্গল-কাব্যের অনুরূপ শিব, দুর্গা, শ্রীকৃষ্ণ, মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্য-বিষয়ক কাব্যও হয় তো ছিল।

বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইতে খ্রীষ্টীয় ১২০০ পর্যন্ত হইল বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম বা আদি যুগ। তুর্কীদের বাঙ্গালা বিজয়ের কালে দেশের উপর দিয়া একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছিল—১২০০ হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর

ধরিয়া বাঙ্গালাদেশে সাহিত্য- বা বিদ্যা-চর্চার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই দেড়শত বৎসর ধরিয়া বিজিগীষু মুসলমান তুর্কীদের হাতে বাঙ্গালার হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; এটা একটা যুগান্তরের কাল দেশময় মারামারি, কাটাকাটি, নগর- ও মন্দির-ধ্বংস, অভিজাত বংশীয় ও পণ্ডিতদের উচ্ছেদ, প্রভৃতি অরাজকতা চলিয়াছিল; এরূপ সময়ে বড় দরের সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। ক্রমে দেশে মুসলমান-রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, শান্তি ও স্বস্তি আবার ফিরিয়া আসিল। দেশের মধ্যে ধীরে ধীরে যেমন মুসলমান ধর্মের প্রসার ঘটিতে লাগিল, তেমন হিন্দুদের মধ্যেও নিজেদের সংস্কৃতিকে দৃঢ় করিবার জন্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনা আরম্ভ হইল; এবং দেশে হিন্দু রাজা ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায়, এবং মিথিলা, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রত্যাগত পণ্ডিতগণের শিক্ষায় যেমন সংস্কৃতের চর্চার পুনরায় আরম্ভ হইল, তেমনি বাঙ্গালা ভাষার মধ্য দিয়া সাধারণে এইগুলির পুনঃ-প্রচারের প্রয়াস দেখা দিল; দেশের কবিরা প্রাচীন সাহিত্য অবলম্বন করিয়া বড় বড় কাব্য-গ্রন্থ এবং খণ্ড-কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। ইহাই হইতেছে মুসলমান যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার মূল প্রেরণা। শিক্ষিত হিন্দু অর্থাৎ উচ্চবর্ণের হিন্দু এই কাজে অগ্রণী হইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এক নবীন যুগে প্রবেশ করিল। বাঙ্গালাদেশে যে সমস্ত তুর্কী ও অন্য বিদেশী মুসলমান বসবাস করিয়াছিল, তাহারা বাঙ্গালা-ভাষী হইয়া পড়িল—তখনও পশ্চিমের উর্দু ভাষার উদ্ভব হয় নাই—রাজকার্যে ফারসী এবং ধর্মকার্যে আরবী ব্যবহার করিলেও ইহারা বাঙ্গালা বলিত ও বুঝিত, এবং সাধারণতঃ ইহাদের ঘরে কেবল বাঙ্গালাই ব্যবহৃত হইত। এতদ্ভিন্ন, উচ্চবংশীয় হিন্দু কোনও কোনও ক্ষেত্রে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর লোকেও কিছু পরিমাণে রাজার জাতির ধর্ম স্বীকার করিয়া লইল; মুসলমান হওয়ার পরও মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতি টান থাকা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক-ই ছিল। এই সব কারণে, বাঙ্গালার মুসলমান রাজাদের সভায়

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক হইতেই যে দেশ-ভাষার প্রতি অনুরাগ এবং সহানুভূতি দেখা দিবে এবং দেশীয় সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছু নাই।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে যেরূপ যুগ-বিভাগ করিতে পারা যায় ("বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধেও সেইরূপ যুগ-বিভাগ প্রশস্ত। বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগগুলি এই—

১। প্রাচীন বা মুসলমান-পূর্ব যুগ ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

২। তুর্কী-বিজয়ের যুগ—১২০০ হইতে ১৩০০ পর্যন্ত।

৩। আদি মধ্য-যুগ বা প্রাক্ চৈতন্য যুগ—১৩০০ হইতে ১৫০০ পর্যন্ত।

৪। অন্ত্য মধ্য-যুগ—১৫০০ হইতে ১৮০০ পর্যন্ত।

[ক] চৈতন্য-যুগ বা বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রধান যুগ—১৫০০-১৭০০।

[খ] অষ্টাদশ শতক (নবাবী আমল)—১৭০০-১৮০০।

৫। নবীন বা আধুনিক বা ইংরেজী যুগ—১৮০০ হইতে

প্রথম দুই যুগের কথা আগেই বলা হইয়াছে। আদি মধ্য যুগ বা প্রাক্-চৈতন্য যুগ—ইহার প্রথম এক শত বৎসরের খবর আমরা বিশেষ কিছু জানি না। খুব সম্ভব এই যুগে (এবং আংশিক ভাবে ইহার পূর্বের যুগে) বাঙ্গালা ভাষায় বেহুলা-লখিন্দর, লাউসেন, রাজা গোপীচাঁদ, এবং ফুল্লরা-কালকেতু, ও ধনপতি-শ্রীমন্ত সদাগরের কথা লইয়া প্রথম কাব্য রচনা করা হইয়াছিল। সে সব কাব্য এখন আর নাই, তবে সেগুলির আশ্রয় অবলম্বন করিয়া পরবর্তী কালে বহু কবি বড় বড় 'মঙ্গল-কাব্য' রচিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার পুনরভ্যুদয়ের ফলে, এক দিকে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির আখ্যায়িকা লইয়া বাঙ্গালায় কাব্য রচনা আরম্ভ হইল—প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ও পুণ্যময় স্মৃতি এইরূপে বাঙ্গালার জন-সাধারণের মানস-চক্ষের সমক্ষে ধরা হইল; অন্য দিকে দেশের প্রাচীন ধর্ম-বিগ্রহের এবং পারিবারিক আদর্শের কাহিনী লইয়া খাঁটী বাঙ্গালী পুরাণ-কথা—বেহুলা, ফুল্লরা,

খুল্লনার কথা, লাউসেনের কথা, রাজা গোপীচাঁদের কথা—এইগুলিকে লইয়া বড় দরের সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টা হইল

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে দুইটী প্রধান ধারা দেখা যায়—[১] আখ্যায়িকাময় 'মঙ্গল' কাব্যের ধারা, ও [২] গীতি-কবিতা বা 'পদ' অথবা 'পদাবলী'র ধারা। এই গীতি-কবিতা দেবতাদের—পরবর্তী কালে বিশেষ করিয়া রাধাকৃষ্ণের—লীলা অবলম্বন করিয়া রচিত হইত। বাঙ্গালাদেশ তুর্কীদের দ্বারায় বিজিত হইবার পূর্বেই এই দুই ধারা এদেশে একপ্রকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। 'মঙ্গল' এবং 'পদ' বা 'পদাবলী' এই দুইটী শব্দই কবি জয়দেবের সময়েই বাঙ্গালাদেশে রূঢ়ি হইয়া যায়। জয়দেব কবি সংস্কৃতে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক যে কাব্য রচনা করেন, তাহার প্রচলিত নাম 'গীতগোবিন্দ'—কিন্তু জয়দেব তাহার বর্ণনা দিয়াছেন 'মঙ্গল' শব্দ দ্বারা ('শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদম্ মঙ্গলম্ উজ্জ্বলগীতি') এই উজ্জ্বল-গীতি অর্থাৎ প্রেমভক্তিময় সঙ্গীতযুক্ত মঙ্গলের মধ্যে কবি নিজের রচিত 'মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী' অর্থাৎ রাগ-তাল-সংবলিত চব্বিশটী ভক্তি-মধুর পদ বা গানের সমষ্টিও সন্নিবেশিত করিয়াছেন. প্রাচীন বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান—যাহা 'চর্যা-গান' বা 'চর্যা-পদ' নামে অভিহিত—উক্ত গানগুলির সংস্কৃত টীকায় 'পদ' নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

জয়দেব কবির পদ-রচনার ধারা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবর্তন করিয়াছিলেন 'বড়ু চণ্ডীদাস' যাঁহাকে বাঙ্গালার পুরাতন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলা যাইতে পারে। বড়ু চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যথাযথ কোনও সংবাদ জানা যায় না. বাঙ্গালা ভাষার বৈষ্ণব সাহিত্যে 'চণ্ডীদাস' নামক কবির সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সে-সব গল্পের ঐতিহাসিক মূল্য বড় বেশী নাই। এইটুকু অনুমান হয় যে, বাঙ্গালাদেশে বিভিন্ন কালে একাধিক চণ্ডীদাস বিদ্যমান ছিলেন। দুইজন (এবং খুব সম্ভব তিনজন) চণ্ডীদাস-নামা পদ-রচয়িতা ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আদি বা প্রাচীনতম যিনি, তিনি 'বড়ু' এই উপনামে খ্যাত; ইনি বাসলী-দেবীর সেবক ছিলেন, এবং ইঁহার আর একটী

নাম ছিল 'অনন্ত', ও উপাধি ছিল 'বড়ু'; এই প্রথম চণ্ডীদাসের বা 'বড়ু'-চণ্ডীদাসের-ই পদ চৈতন্যদেব শুনিতেন,—ইনি নিশ্চয়-ই চৈতন্যদেবের পূর্বেকার ব্যক্তি; এবং ইহা অসম্ভব নহে যে খ্রীষ্টীয় ১৪০০ সালের পূর্বেও তিনি জীবিত ছিলেন। 'বড়ু'-চণ্ডীদাস পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর (নাড়ুড়, নাত্তর, বা নান্নোর) গ্রাম, এবং বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতনা গ্রাম, এই উভয় স্থলে 'চণ্ডীদাস' কবির বাস ছিল, এইরূপ জনশ্রুতি বিদ্যমান; উভয় গ্রামেই প্রবাদ প্রচলিত যে স্থানীয় গ্রাম-দেবী (নান্নুরের বিশালাক্ষী বা বাশুলী, এবং ছাতনার বাশুলী) চণ্ডীদাসের উপাস্য ছিলেন। আদি বা 'বড়ু'-চণ্ডীদাস নান্নুরে অথবা ছাতনায় বাস করিতেন, তাহা নির্ণয় করা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য; দুইটীই প্রাচীন স্থান। তবে অনুমান হয় যে পরবর্তী যুগে আদি বা 'বড়ু'-চণ্ডীদাসের নাম-যশ ও লোক-প্রিয়তা এত বিস্তৃত হয় যে, অন্য লোকের লেখা বিস্তর পদ তাঁহার নামে চলিতে থাকে। 'বড়ু'-চণ্ডীদাস ভিন্ন, 'দ্বিজ'-চণ্ডীদাস নামে সম্ভবতঃ আর একজন পদকর্তা ছিলেন, তবে ইঁহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। এই 'দ্বিজ'-চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের ঈষৎ পরে জীবিত ছিলেন—'বড়ু' ও 'দীন' উভয়ের মাঝামাঝি কোনও সময়ে সম্ভবতঃ তিনি পদ রচনা করেন, এবং চৈতন্যদেবের চরিত্র দর্শন করিয়াই পদ রচনায় ইনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়—চণ্ডীদাস-নামাঙ্কিত বহু সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ পদ এই অজ্ঞাতপরিচয় 'দ্বিজ'-চণ্ডীদাসের-ই কৃতি বলিয়া মনে হয়। এতদ্ভিন্ন, 'দীন'-চণ্ডীদাস নামে পরবর্তী এক কবি বহুশত-পদময় শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক এক বিরাট্ কাব্য রচনা করেন। এই 'দীন'-চণ্ডীদাস-সম্বন্ধে আমরা অপেক্ষাকৃত নিঃসংশয়; ইনি চৈতন্যদেবের বহু পরের লোক। ইনি খুব উঁচু দরের কবি ছিলেন না, কিন্তু পদ লিখিয়া গিয়াছেন অনেক; 'চণ্ডীদাস' ভণিতায় যত পদ প্রচলিত, সেগুলির বেশীর ভাগই এই 'দীন'-চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া মনে হয়। 'দ্বিজ'-চণ্ডীদাস বলিয়া কোনও কবি থাকিলে, তিনি নিশ্চয়ই চৈতন্যদেবের পরবর্তী; তবে ইহা-ও সম্ভব যে, সাধারণ

কীর্তনিয়া ও অজ্ঞাত কবির হাতে 'বড়ু'-চণ্ডীদাসের পদের ভাবের সহিত চৈতন্যদেবের চরিত্রের আদর্শ মিলাইয়া যে কতকগুলি সুন্দর পদ সৃষ্ট হইয়াছিল, সেগুলি না 'বড়ু' চণ্ডীদাসের, না উপরে আলোচিত 'দীন'-চণ্ডীদাসের—সেগুলি 'চণ্ডীদাস'-নামে প্রচলিত হইয়া, 'বড়ু' ও 'দীন' চণ্ডীদাসের সম্মিলিত পদাবলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে—'চণ্ডীদাস' এই নামের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। ১২০০-র অধিক পদ এখন 'চণ্ডীদাস'-এর নামে প্রচলিত। এগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি কোন্ চণ্ডীদাসের রচনা, এবং যে আকারে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত এই পদগুলি পাইতেছি সেগুলির মধ্যে 'বড়ু', 'দ্বিজ' বা 'দীন' চণ্ডীদাসের মূল রচনা কতটুকুই বা রক্ষিত আছে, এ-সব কথার নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে। অধিকাংশ পদ অনেক পরবর্তী পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে; লেখক ও গায়কের মুখে মূল রচনার ভাষা বদলাইয়াছে। দুই বা তিন চণ্ডীদাস ('বড়ু' ও 'দীন', এবং সম্ভবতঃ 'দ্বিজ') এবং অন্য অজ্ঞাত-নামা কবির লেখা একসঙ্গে মিলিয়া, এক 'চণ্ডীদাস-পদাবলী' রূপে এখন আমাদের সমক্ষে বিদ্যমান। ভাবে ও ভাষায় অনৈক্যযুক্ত এই পদ-সমষ্টি বিশ্লেষ করিয়া সাজানো এক কঠিন ব্যাপার। সৌভাগ্য-ক্রমে 'বড়ু'-চণ্ডীদাসের লেখা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে একখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে; ইহার পুঁথিখানি খুবই প্রাচীন, বিশেষজ্ঞগণের মতে খ্রীষ্টীয় ১৪৫০ হইতে ১৫২০-র মধ্যে পুঁথিখানি অনুলিখিত হইয়াছিল। এই পুঁথির ভাষার প্রাচীনতা দেখিয়া মনে হয়, ইহাতে 'বড়ু'-চণ্ডীদাসের খাঁটী রচনা অনেকটা অবিকৃত-রূপে পাওয়া যাইতেছে। প্রচলিত চণ্ডীদাস-পদাবলীতে যাহা মিলিতেছে, তাহার অধিকাংশই 'বড়ু'-চণ্ডীদাসের নহে; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার ও ভাবের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিয়া বিচার করিলে মনে হয় যে, 'চণ্ডীদাস'-এর নামে প্রচলিত ১২০০-র অধিক পদের মধ্যে ২০।২৫টীর বেশী 'বড়ু'-চণ্ডীদাসের নহে। প্রচলিত 'চণ্ডীদাস'-নামাঙ্কিত পদগুলির অধিকাংশই 'দীন'-চণ্ডীদাসের রচিত পদময় কাব্য হইতে গৃহীত। আবার, সহজিয়া সম্প্রদায়ের কবিদের রচিত সহজিয়া মতের বহু পদ 'চণ্ডীদাস'-

রচিত পদ-সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। 'চণ্ডীদাস', এই নামের আড়ালে যে কয় জন শ্রেষ্ঠ এবং সাধারণ কবি বিদ্যমান, তাঁহাদের পদের পৃথক্-করণ, বিচার বিশ্লেষণ ও সম্বন্ধ আলোচন, বাঙ্গালা সাহিত্যের এক জটিলতম বিষয়।

রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বন করিয়া 'বড়ু'-চণ্ডীদাস-প্রমুখ বাঙ্গালার পদ-রচয়িতৃ-গণ, একাধারে গভীর ভগবদনুভূতি এবং প্রেমিক হৃদয়ের সঙ্গে পরিচয়, উভয়-ই সার্থক-ভাবে দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালার তথা ভারতের আধ্যাত্মিক এবং প্রেমের সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বৈষ্ণব পদাবলী একটী অমূল্য বস্তু।

বড়ু চণ্ডীদাসের কিছু পরে কৃত্তিবাস ওঝার উদ্ভব। রামায়ণের কথা বাঙ্গালায় যাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনি একজন প্রথম ও প্রধান কবি। কিন্তু ইঁহার জন্মের সন তারিখ লইয়া নিশ্চয়তা নাই। তবে ইঁহার জন্ম খ্রীষ্টীয় ১৩৯৯ সালে হইয়াছিল, এইরূপ অভিমত প্রকাশিত ও গৃহীত হইয়াছে। খুব সম্ভব, সমগ্র বঙ্গদেশের স্বাধীন হিন্দু রাজা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশীয় 'কাঁস' অর্থাৎ কংসের সভায়, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে, ইনি বাঙ্গালা রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। (ফারসী ইতিহাসে এই স্বাধীন হিন্দু রাজার নাম كانس Kans 'কান্‌স্' অর্থাৎ 'কাঁস,' 'কাংস' বা 'কংস'; ঐ সময়ে 'চণ্ডীচরণ-পরায়ণ' 'দনুজমর্দনদেব' নামে এক স্বাধীন হিন্দু রাজার রৌপ্য মুদ্রা, গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের টাঁকশালের উল্লেখ সমেত, পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে প্রমাণ হয় যে, সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়িয়া ইঁহার অধিকার ছিল। কেহ-কেহ 'কাংস' ও 'দনুজমর্দনদেব'কে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, এবং সম্ভবতঃ এই মতই ঠিক;—স্বাধীন হিন্দু রাজার আমলে নূতন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।) কৃত্তিবাসের সহিত রাজা কংসের মিলন খ্রীষ্টীয় পনেরোর শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষাশেষি ঘটিয়া থাকিলে, ইহার কিছু পরে (অর্থাৎ ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে) তাঁহার 'রামায়ণ' রচিত হয়। কিন্তু এই রামায়ণের প্রাচীনতম পুঁথি ১৫৮০ ও ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের। কৃত্তিবাস-রচিত

বাঙ্গালা রামায়ণ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার-প্রমুখ পণ্ডিতদের হাতে 'সংশোধিত' ও বিশেষ-ভাবে পরিবর্তিত আকারে শ্রীরামপুরের পাদ্রিদের দ্বারায় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল ; এই মুদ্রণের ফলে কৃত্তিবাসের প্রচার, সমগ্র বঙ্গদেশে অন্যান্য রামায়ণের কবিদের অপেক্ষা যে অধিক করিয়া হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

চৈতন্যদেবের পূর্বে বা তাঁহার বাল্যকালে আর যে সমস্ত কবি ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বরিশাল-জেলার ফুল্লশ্রী-গ্রাম-নিবাসী বিজয় গুপ্ত মনসাদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ বেহুলা-লখিন্দরের গল্প অবলম্বনে 'পদ্মা-পুরাণ' লেখেন ; এবং এই কাহিনী লইয়া, বাদুড়িয়া বটগ্রাম নিবাসী বিপ্রদাস চক্রবর্তীও ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে একখানি 'মনসা-মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-লীলা লইয়া, বর্ধমান-কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বসু (উপনাম 'গুণরাজ খাঁ') 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' নামে সুন্দর একখানি কাব্য লেখেন (১৩৯৫-১৪০২ শকাব্দ = ১৪৭৩-১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে)। ইঁহারা সকলেই পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদে জীবিত ছিলেন। নানা দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, বাঙ্গালা দেশের মানসিক সংস্কৃতির পক্ষে এই সময় একটী লক্ষণীয় যুগ। বড় বড় সংস্কৃত পণ্ডিত এই সময়ে আবির্ভূত হন, যেমন স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ও নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি। নানা ভাবে হিন্দু বাঙ্গালীর সমাজকেও সুদৃঢ় করিবার প্রয়াস-ও এই সময়ে দেখা দেয়। চৈতন্যদেব এই সময়েই আবির্ভূত হন। বাঙ্গালার স্বাধীন মুসলমান রাজা সুলতান হোসেন শাহ (ইঁহার রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় ১৪৯৩-১৫১৯) বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। ইঁহার ও ইঁহার পুত্র রাজা নসরত খাঁর অধীনে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁ ও ছুটী খাঁ বাঙ্গালায় মহাভারতের অনুবাদ করান।

চৈতন্যদেবের পূর্বের এই যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন হিন্দু যুগের ইতিহাস-পুরাণের প্রচার, প্রাচীন বাঙ্গালার ধর্ম ও বীরগাথা এবং দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কীর্তন, এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করিয়া

গভীর ভাবের আধ্যাত্মিক গীতিকবিতা,—এইগুলি লইয়া ব্যাপৃত ছিল। এই সময়ে পূর্ব-ভারতে মিথিলা-প্রদেশ ছিল সংস্কৃত-চর্চার প্রধান কেন্দ্র। কাশী, দক্ষিণ-বিহার ও বাঙ্গালাদেশ যখন তুর্কীদের অধীন, তখন মিথিলা স্বাধীন ছিল, মিথিলায় হিন্দু রাজাদের আশ্রয়ে পণ্ডিতেরা নিরুদ্বেগে সংস্কৃতের চর্চা করিতেন। বাঙ্গালীর ছেলেরা সংস্কৃতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্য, বিশেষ করিয়া ন্যায় ও স্মৃতি পড়িবার জন্য, মিথিলায় যাইত। মিথিলার দেশভাষার নাম মৈথিলী; ইহা বাঙ্গালার মত-ই মাগধী-প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন, এবং অনেক বিষয়ে মৈথিলী বাঙ্গালার সহিত মিলে। মৈথিল পণ্ডিতেরা মাতৃভাষার আদর করিতেন; জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর (খ্রীঃ ১৩২৫) প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা মৈথিলী ভাষায় পুস্তক রচনা করেন। মিথিলার কবিরা নানা বিষয়ে গান বাঁধিতেন। মিথিলার এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও কবি ছিলেন বিদ্যাপতি ঠাকুর (আনুমানিক ১৩৫০ হইতে ১৪৫০-এর মধ্যে ইঁহার জীবৎকাল)। বিদ্যাপতি অতি উচ্চদরের কবি ছিলেন; তাঁহার ভাব যেমন মার্জিত ও সুন্দর, ভাষাও ছিল তেমনি মধুর। বাঙ্গালীর ছেলেরা মিথিলায় গিয়া সংস্কৃত তো পড়িত-ই, মৈথিলীতে রচিত গানও তাহারা শিখিত। এই সব গান তাহাদের দ্বারা বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত হয়, বাঙ্গালীদের মধ্যে বিদ্যাপতির পদের খুব নাম ও আদর হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর মুখে পদগুলির মৈথিলী ভাষা বিশুদ্ধ রহিল না, ভাষাটী ভাঙ্গিয়া কোথাও বাঙ্গালার মতন হইয়া গেল, কোথাও নূতন মূর্তি ধরিয়া বসিল; আবার কোথাও বা পশ্চিমের (মথুরা-অঞ্চলের) হিন্দীর (‘ব্রজভাখা’-র) রূপ-ও ইহাতে দুই এক জায়গায় আসিয়া গেল। এইরূপে বিদ্যাপতির মূল মৈথিলী, বাঙ্গালাদেশে এক নূতন মিশ্র রূপ ধরিয়া বসিল, তাহা না-মৈথিলী না-বাঙ্গালা, এবং তাহাতে পশ্চিমা হিন্দীর এবং পশ্চিমা অপভ্রংশেরও ছিটাফোঁটা আছে; কিন্তু সকলেই তাহা বুঝিতে পারে, এবং লালিত্যে ও শ্রুতিমাধুর্যে এই মিশ্র ভাষা অনুপম হইয়া দাঁড়াইল। পরে এই ভাষার নাম-করণ হইল ‘ব্রজবুলী’—অর্থাৎ যে বুলী বা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা গীত হয়। বিদ্যাপতির মূল মৈথিলী পদের ব্রজবুলী

রূপের অনুকরণ করিয়া পরে বাঙ্গালা দেশের অন্য অনেক কবি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতক হইতে রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে গীত রচনা করিতে লাগিলেন ; এইরূপে এই কৃত্রিম কবিতার ভাষা ব্রজবুলীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ছায়ায় নূতন এবং মনোহর একটী বড় সাহিত্য গড়িয়া গেল। বাঙ্গালাদেশের বাঙ্গালী কবি কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি বা 'ছোট বিদ্যাপতি' (ইহার অনেক পদ আদি বা মৈথিল বিদ্যাপতির নামেই বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত) এবং গোবিন্দদাস ব্রজবুলীর শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। এখনও অনেক বাঙ্গালী কবি এই ব্রজবুলীতে কবিতা লিখিয়া থাকেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কতকগুলি অতি সুন্দর গীতি-কবিতা ('ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী') ইহাতে লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় এই কৃত্রিম ব্রজবুলী ভাষার উদ্ভব চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বেই হইয়াছিল, আসামে আমরা পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই ব্রজবুলী কবিতা পাই, উড়িষ্যায় চৈতন্যদেবের জীবনকালেই পাই।

ব্রজবুলীতে বিরচিত বিদ্যাপতির পদগুলি বাঙ্গালায় এত লোকপ্রিয় হইয়াছিল যে, বিদ্যাপতি যে আসলে বাঙ্গালার কবি নহেন, মিথিলার কবি, বাঙ্গালী ক্রমে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে বিদ্যাপতির নাম, আদি-যুগের বৈষ্ণব কবি বোধে এমনি ভাবে সম্মিলিত, যে একের নাম করিতে অপর জনের নাম আপনিই আসিয়া যায়।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ও ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তিরোধান হয়। ইহার ব্যক্তিত্বে বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক ও মানসিক জগতে এক অপূর্ব প্রেরণা আসিয়াছিল—বাঙ্গালীর ইতিহাসে ইনি অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। ইহার সম্বন্ধে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যে বলিয়াছেন—'বাঙ্গালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধ'রেছে কায়া'—তাহা সার্থক উক্তি। চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে ভগবদ্ভক্তির স্রোত বহাইয়া দেন, বহু প্রাচীন কদাচার ও কুসংস্কার তাঁহার-ই প্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া যায়। যে নূতন ভাবধারা তাঁহার জীবন ও শিক্ষা হইতে বঙ্গদেশে ও উৎকলে আসে, তাহার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে ও

উড়িয়া সাহিত্যে এক যুগান্তর আসিয়া উপস্থিত হয়। চৈতন্যদেবের শিষ্য ও ভক্তেরা তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্গভাষায় নিজেদের প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন,—বাঙ্গালায় এক বিরাট্ বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। এই সাহিত্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করা এখানে সম্ভবপর হইবে না। বাঙ্গালী জাতিকে এই সাহিত্যের একটী প্রধান দান, মহাপুরুষের চরিত্র। চৈতন্যদেবের ও তাঁহার পরিকরদের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ সাধকের পবিত্র জীবন-চরিত লিখিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার উপযোগিতা এবং গৌরব বাড়াইয়া দিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রধান পুস্তক এইগুলি:—[১] গোবিন্দদাস-কৃত 'কড়চা'—গোবিন্দদাস কর্মকার চৈতন্যদেবের ভৃত্যরূপে তাঁহার সঙ্গে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আসেন, এই বইয়ে তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী ও চৈতন্যদেব-সম্বন্ধে নানা কথা তিনি সুন্দর সরল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; এই পুস্তকের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কিন্তু বিশেষ সন্দেহ আছে; [২] বৃন্দাবনদাস কৃত 'চৈতন্য-ভাগবত' (১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ)—ইহাতে সহজ ভাষায় চৈতন্য-দেবের জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে; এই গ্রন্থে সমগ্র চৈতন্য-জীবনী পাওয়া যায় না, এবং চৈতন্যদেবের জীবনে নানা অলৌকিক ব্যাপারের কথা ইহাতে আছে; [৩] লোচনদাস-(১৫২৩-১৫৮৯) কৃত 'চৈতন্য-মঙ্গল'—ইহাতে চৈতন্যদেবকে দেবতাভাবে দেখা হইয়াছে, ভাষার মাধুর্যে এই জীবন-চরিত অতি সুন্দর; [৪] কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত 'চৈতন্য-চরিতামৃত' (? ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ)—এই বই বঙ্গভাষার এক অপূর্ব বস্তু—একাধারে জীবন-চরিত এবং চরিত্র-চিত্রণ, অপার্থিব ভক্তি এবং দার্শনিক তত্ত্বের বিচারের সমাবেশ ইহাতে বিদ্যমান; [৫] জয়ানন্দ-কৃত 'চৈতন্য-মঙ্গল' (ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে ?)—অতি সরল ও মনোরম ভাবে লেখা এই জীবন-চরিতখানি হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়; [৬] নিত্যানন্দ-কৃত 'প্রেমবিলাস' (১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ), [৭] যদুনন্দনদাস কৃত 'কর্ণানন্দ' (১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ), [৮] ঈশান নাগর-কৃত 'অদ্বৈত প্রকাশ' (১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দ); [৯] নরহরি চক্রবর্তীর কৃত 'ভক্তিরত্নাকর'—ইহাতে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক

বৈষ্ণব ভক্তগণের জীবনের নানা ঘটনা, এবং নানা বৈষ্ণব মতবাদ বিবৃত হইয়াছে। অলৌকিক ব্যাপারে পূর্ণ হইলেও, এই জীবন-চরিতগুলি-দ্বারা মহাপুরুষদিগের শ্রদ্ধা দেখাবার একটী উপযোগী উপায় বাঙ্গালী জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাহিরে বাঙ্গালী এ ভাবে দেশের মহাপুরুষদের সমাদর করিতে শিখিল না। প্রায় শত বর্ষ পূর্বে দেওয়ান মাম্লা মণ্ডল নামে একজন মুসলমান কবি, হেষ্টিংসের দেওয়ান কান্তবাবুর নামে 'কান্ত-নামা' বলিয়া একখানি চরিত্র-মূলক কাব্য লেখেন (বাঙ্গালা ১১৯০ সাল); তদ্রূপ পুস্তক বাঙ্গালায় আর বিশেষ মিলে না।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অনুকরণে বহু কবি বাঙ্গালা ভাষায় ও ব্রজবুলীতে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ও চৈতন্যদেব-বিষয়ক পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা তখন নবীন বৈষ্ণব দর্শন ও মতবাদের প্রভাবে পড়িয়া একটী বিশেষ আধ্যাত্মিক ব্যাপার-রূপে কল্পিত হইতেছে, এবং চৈতন্যদেবের জীবনী ও শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার মধ্যে ভক্তগণ একটী সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মিল দেখিতে পাইতেছেন। দুই শতের অধিক কবি পদ রচনা করিয়া বাঙ্গালা ভাষার গীতি-সাহিত্যকে মহার্ঘ রত্নের দ্বারা মণ্ডিত করিয়া দেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবি অনেক ছিলেন, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন [১] গোবিন্দদাস কবিরাজ (? ১৫৩৭-১৬১২) —ইনি ব্রজবুলীতে অতুলনীয় মাধুর্যময় ভাষার প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, ইনি বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাবের অনুসরণ করিয়াছেন; [২] জ্ঞানদাস (জন্ম আনুমানিক ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ)—ইনি বড়ু-চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য ছিলেন; [৩] কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি, বা 'ছোট বিদ্যাপতি'; [৪] রায়শেখর; [৫] বলরাম দাস; [৬] নরোত্তম দাস—ইঁহার রচিত ভগবদ্-বিষয়ক কতকগুলি প্রার্থনা-গীতি বাঙ্গালা ভাষায় অতি সুন্দর বস্তু। এই পদকর্তৃগণ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণব কবি ও ভক্তগণের মধ্যে প্রধান।

প্রথম যুগে রচনা, পরবর্তী যুগে আলোচনা,—সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে,

আদি (অর্থাৎ প্রাক্-চৈতন্য) যুগের ও পরবর্তী যুগের (অর্থাৎ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের) পদকর্তৃগণের পদ একত্র করিয়া কতকগুলি সংগ্রহ-পুস্তক গঠিত হয়। এইরূপ সংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যে বর্ধমান-শ্রীখণ্ড-নিবাসী রামগোপাল দাস-কৃত 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-রসকল্পবল্লী' ও রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাস-কৃত 'রসমঞ্জরী' (সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ), বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কৃত 'ক্ষণদা-গীতচিন্তামণি' (অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভ), দীনবন্ধু দাসের 'সঙ্কীর্তনামৃত' ও গৌরসুন্দর দাসের 'কীর্তনানন্দ' (অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ), রাধামোহন ঠাকুর কৃত 'পদামৃত-সমুদ্র' (সংস্কৃত টীকাসহ বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদ, আনুমানিক ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ), এবং বৈষ্ণবদাস-(অথবা গোকুল কৃষ্ণানন্দ সেন সঙ্কলিত 'পদকল্পতরু' (অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, আনুমানিক ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ),— এগুলি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর ও আধুনিকতর আরও কতকগুলি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সংগ্রহ-পুস্তক আছে। 'পদকল্পতরু' গ্রন্থখানি এই সমস্ত প্রাচীন পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থমধ্যে সর্বাপেক্ষা বিরাট্, ইহাতে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বিচার- ও নির্দেশ-অনুসারে সজ্জিত ৩১০১টী পদ আছে; এক হিসাবে এই বইকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের ঋগ্বেদ' বলা যাইতে পারে। এই সব সংগ্রহ-পুস্তকের সাহায্যে, বাঙ্গালা, ব্রজবুলী ও সংস্কৃতে রচিত বৈষ্ণব 'মহাজন-পদাবলী' রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।

সাহিত্যের অন্যান্য ধারা অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। বৈষ্ণব যুগে সংস্কৃতের প্রভাব বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আসিতে থাকে। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের হাতে একটী বিরাট্ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠে। এই গোস্বামিগণের মধ্যে সনাতন গোস্বামী, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপ গোস্বামী, এবং রূপ ও সনাতনের ভ্রাতা অনুপমের পুত্র জীব গোস্বামী, তথা গোপাল ভট্ট (ইঁহারা ষোড়শ শতকের ব্যক্তি), এবং বলদেব বিদ্যাভূষণ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (অষ্টাদশ শতক) ইঁহারা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত পক্ষে ইঁহারাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ গড়িয়া তুলেন। বাঙ্গালী

ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধে প্রাণ দেয়। পরে গৌড়ের রাজার শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ হয়,—লাউসেন তাঁহাদের সন্তান বহু কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া ধর্ম-ঠাকুরের বরে রঞ্জাবতী লাউসেনকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। লাউসেনের বাল্য ও যৌবন, তাঁহার মাতুল ধর্মপাল-রাজার পাত্র মাহুদ্যা বা মহামদ কর্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র, শেষে ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধ ও ইছাই ঘোষের মৃত্যু; এবং নানা সংগ্রামে লাউসেনের জয় ও তাঁহার অন্য নানা অলৌকিক কীর্তি—এই সব কাহিনী অবলম্বন করিয়া রচিত কাব্যগ্রন্থ, প্রাচীন বাঙ্গালার, বিশেষতঃ রাঢ়ের অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের লোকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনিত। বৌদ্ধ ধর্ম-ঠাকুরের মাহাত্ম্যের সহিত এই সব কাহিনী জড়িত। এই উপাখ্যান-মণ্ডলী লইয়া অনেক কবি বাঙ্গালায় 'ধর্ম-মঙ্গল' কাব্য লিখিয়া যান। তন্মধ্যে মাণিক গাঙ্গুলীর 'ধর্ম-মঙ্গল' একখানি লক্ষণীয় পুস্তক, সম্পূর্ণ রূপে এইটী পাওয়া গিয়াছে, ইহার রচনা-কাল খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমেই। অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে রচিত ঘনরামের 'ধর্ম-মঙ্গল'ও এই উপাখ্যান-বিষয়ক একখানি সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক।—চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্য-বর্ণনা-প্রসঙ্গে কালকেতু ব্যাধ এবং ধনপতি সদাগর ও তৎপুত্র শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যান লইয়া, ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মাধবাচার্য এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী একখানি করিয়া 'চণ্ডী-মঙ্গল' কাব্য লেখেন। কবিকঙ্কণের কাব্যখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী অতি উজ্জ্বল রত্ন। প্রাচীন বাঙ্গালার সমাজ ও রীতি-নীতির অমূল্য চিত্র এই পুস্তকে আছে। চরিত্র-চিত্রণেও কবিকঙ্কণ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার চণ্ডী-কাব্যের কালকেতু ও ফুল্লরা, ধনপতি লহনা ও খুল্লনা, দুর্বলা দাসী ও ভাঁড়ুদত্ত প্রভৃতি অতি সজীব চরিত্র। সত্য ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত জনসাধারণের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না এই বইয়ে বর্ণিত আছে। কবিকঙ্কণ আমাদের যুগের মানুষ হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মতন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই

সংস্কৃত হইতে অনুবাদের ধারা বৈষ্ণব লেখকদের হাতে অক্ষুণ্ণ ছিল।

পুরাণ-কথা ভাষায় নূতন করিয়া শুনাইবার রীতি কখনও লুপ্ত হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভাগবতাচার্য্য রঘুনাথ 'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী' নাম দিয়া ভাগবত-পুরাণের এক উৎকৃষ্ট অনুবাদ রচনা করেন। সপ্তদশ শতকের প্রথমেই কাশীরাম দাস বাঙ্গালায় মহাভারত-কাহিনী লেখেন। এই মহাভারত-ই এখন বাঙ্গালা দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। বর্ধমান সিঙ্গি গ্রামবাসী কবি কাশীরাম দেব একটী বিশিষ্ট কবিবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণকিঙ্কর 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' নামে কাব্য রচনা করেন, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর 'জগন্নাথ-মঙ্গল' নামে জগন্নাথ-মাহাত্ম্য-বিষয়ক কাব্য প্রণয়ন করেন। কাশীরামের বহু-পূর্বে, ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে, বাঙ্গালার সুলতান হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁয়ের আদেশে চট্টল প্রান্তের অধিবাসী কবীন্দ্র ও শ্রীকর নন্দী কর্তৃক 'বিজয়-পাণ্ডব-কথা' নামে মহাভারতের একটী উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা অনুবাদ রচিত হইয়াছিল, এক সময়ে এই বই চট্টল ও কুমিল্লা অঞ্চলে বিশেষ আদৃত ছিল।

চাঁদ সদাগর ও বেহুলা-লখিন্দরের উপাখ্যান এবং মনসাদেবীর মাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া ষোড়শ শতকে ময়মনসিংহের কবি নারায়ণদেব এবং দ্বিজ বংশীদাস একখানি করিয়া 'পদ্মাপুরাণ' লেখেন, এবং সপ্তদশ শতকে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ 'মনসার ভাসান' কাব্য রচনা করেন।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালায় বৌদ্ধ আচার্য্যদের কথা লইয়া, এবং রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদের উপাখ্যান লইয়া, ভবানীদাসের 'ময়নামতীর গান,' দুর্লভ মল্লিক-কৃত 'গোবিন্দচন্দ্র গীত'-প্রমুখ কতকগুলি কাব্য রচিত হয়। রাজা মাণিকচাঁদের পুত্র গোপীচাঁদ অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া না গেলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, ইহা গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতী যোগবলে জানিতে পারিয়া, অনিচ্ছুক পুত্রকে তৎপত্নীদ্বয় অদুনা ও পদুনার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। সন্ন্যাসী অবস্থায় গুরুর সহিত গোপীচাঁদের ভ্রমণ ও পরে সঙ্কটকাল

'ভোন্‌স্লে' উপাধিধারী মারহাট্টা রাজার আক্রমণ, ও পশ্চিম বঙ্গে 'বর্গীর হাঙ্গামা' অর্থাৎ 'বর্গী' বা 'বারগীর' অর্থাৎ মারহাট্টা লুঠেরা সিপাহীর উৎপাত, বণিক্ ইংরেজের সহিত বাঙ্গালার নবাব সিরাজুদ্দৌলা'র বিবাদ, ও ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের বিরোধিতা ও সেনাপতিগণের বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলে সিরাজুদ্দৌলার পতন—এবং ইংরেজ অধিকারের সূত্রপাত; নবাব মীর-কাসিমের স্বাধীনভাবে রাজ্য চালাইবার চেষ্টার ফলে ইংরেজের সহিত সংঘর্ষ ও মীর-কাসীমের পতন, ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের (বাঙ্গালা সন ১১৭৬ সালের) ভীষণ দুর্ভিক্ষ,—এই দুর্ভিক্ষ বাঙ্গালাদেশে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে সুপরিচিত; এবং ক্রমে ইংরেজের হাতে সম্পূর্ণরূপে রাজশক্তির আগমন। এই সময়ে সাহিত্যে নূতন ধারা দেখা যায় না—পুরাতনেরই অনুকরণ ও অবলম্বন দেখা যায়।

এই যুগে বড় কবি বেশী হইতে পারে নাই। কেবল তিন চারি জনের নাম করিতে পারা যায়—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন (মৃত্যু ১৭৭৫), ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর (? ১৭১২-১৭৬০), ও ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল (অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ ও ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদ—১৭৫২-১৮২১)। রামপ্রসাদ সেন তাঁহার সরল ভাষায় ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে তাঁহার আরাধ্যা দেবীর কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শাক্ত বা দেবী-বিষয়ক পদ বা গানগুলিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ভারতচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে বাস করিতেন। ভারতচন্দ্রের রচিত সুবিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' (১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে) তিন খণ্ডে বিভক্ত—হরগৌরীর লীলা-বিষয়ক অংশ প্রথমে, ও তৎপরে 'বিদ্যাসুন্দর' নামে উপাখ্যান, এবং শেষে জাহাঙ্গীরের সেনাপতি-রূপে বঙ্গে আগত আম্বের-রাজ মানসিংহ ও যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ এবং প্রতাপের মৃত্যু-বিষয়ক ঐতিহাসিক কাহিনী। এতদ্ভিন্ন ভারতচন্দ্রের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাও আছে। তিনি মার্জিত শক্তির কবি, ভাষা-প্রয়োগে তিনি ছিলেন অসাধারণ-রূপে পটু;

তাঁহার কাব্যের দুই-এক স্থলে অশ্লীলতা দোষ থাকিলেও, বর্ণনার সরসতা এবং নিপুণ তুলিকায় চরিত্র-অঙ্কনের শক্তি হেতু, আমরা তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। লোকে এক সময়ে ভারতচন্দ্রকে আমাদের ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মানিত; এবং তাঁহার রচিত ছত্র বা পদ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবাদের মত এত পাওয়া যায় যে, তদ্দ্বারা সহজেই তাঁহার লোকপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে, কলিকাতার দক্ষিণস্থ ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীবাস কালে পদ্মপুরাণের অন্তর্গত কাশীখণ্ডের একটী পদ্যময় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের অন্তর্গত তাঁহার সমসাময়িক কাশীর বর্ণনা, বঙ্গসাহিত্যে একটী নূতন বস্তু।

অষ্টাদশ শতকে লোকে তাল-সম্বলিত গানে ও ছড়ায় প্রীতি লাভ করিত, ভাবের গাম্ভীর্য অপেক্ষা শব্দের চাতুর্যেই তুষ্ট হইত। এই যুগে কবির গান, এবং কবির লড়াই (অর্থাৎ সঙ্গীত করিতে করিতে পরস্পর কথা-কাটাকাটি) বিশেষরূপে প্রচলিত হয়, এবং সংস্কৃত পুরাণের উপাখ্যানগুলি তাহাদের মৌলিক গাম্ভীর্য পরিত্যাগ করিয়া, সাতিশয় প্রাকৃত-জনোচিত ভাবে পাঁচালীর পালায় গীত হইত। কবি দাশরথি রায় (বর্ধমান-কাটোয়ার সন্নিকটে জন্ম, ১৮০৪-১৮৫৭) এই ধরণের 'কবির গান' বা 'পাঁচালী' রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান; ইঁহার গানে ভাষার ঝঙ্কার ও তৎসঙ্গে সমাজ ও মানব-চরিত্র সম্বন্ধে সূক্ষ্ম জ্ঞানের সুন্দর সমাবেশ পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের পত্তন এই অষ্টাদশ শতকে। এ বিষয়ে বিদেশী পোর্তুগীস ধর্মপ্রচারকেরা একটু পথ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিস্‌বন্ নগরে পোর্তুগীস পাদ্রি Manuel da Assumpçaõ মানুএল্-দা-আসুম্প্‌সাঁও-এর বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা-পোর্তুগীস শব্দকোষ প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরেই লিস্‌বন্ হইতে Crepar Xaxtrer Orthbhed 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামে এক গদ্যময় বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হয়, ঐ পুস্তকে গুরু ও শিষ্যের কথোপকথন-চ্ছলে রোমান-কাথলিক ধর্ম-মত ও অনুষ্ঠানের

বর্ণনা আছে। এই দুই বইয়ে রোমান অক্ষরে পোর্তুগীস উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানে বাঙ্গালা অংশ লিখিত হইয়াছে—তখনও বাঙ্গালা অক্ষর ছাপার হরফে উঠে নাই। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর পূর্বে, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে, পোর্তুগীস মিশনারিদের চেষ্টায় খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত ভূষণার এক রাজকুমার খ্রীষ্টান ধর্ম-মত বিষয়ে একখানি বই লিখেন। (এই বইয়ের রোমান অক্ষরে লেখা মূল পুস্তকখানি পোর্তুগালে রক্ষিত আছে। এই পুস্তক এবং পাদ্রি আসম্পসাওঁ-এর পুস্তক দুইখানি, ভূমিকা ও টীকা-টিপ্পনীর সহিত কলিকাতায় পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে)। ইহার ভাষা তেমন মার্জিত নহে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর গদ্য মন্দ নহে। বাঙ্গালা গদ্যের বিকাশে প্রথমে পোর্তুগীস ও পরে ইংরেজ মিশনারিদের কিছু যে হাত ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে ইংরেজদের চেষ্টায় বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রণের ব্যবস্থা হইল। ১৭৭৮ সালে হুগলী হইতে Nathaniel Brassey Halhed নাথানিয়েল্ ব্রাসি হাল্‌হেড্ এর ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়, এবং এক দিকে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে শ্রীরামপুরের মিশনারিরা যেমন বাঙ্গালা বই ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন, অন্য দিকে সেই সময়ে কলিকাতায় ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে, বিলাত হইতে আগত ইংরেজ কর্মচারীদের বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য নিযুক্ত পণ্ডিতদের হাতে, বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য নূতন রূপ পাইবার চেষ্টা করিল।

উনবিংশ শতকে এইরূপে এক নবযুগের আরম্ভ ঘটিল। পুরাতন ও নূতন মনোভাবের দ্বন্দ্ব দুই পুরুষ ধরিয়া চলিল; এবং শেষে নূতনের বিজয় ঘটিল—উনবিংশ শতকের মধ্য-ভাগে। আগেকার যুগের কবির লড়াই এবং ভারত-চন্দ্রের অনুকরণে কাব্য-রচনা চলিতেছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ হইল উনবিংশ শতকের গোড়ায়, ও তাহার ফলে নব নব ভাব-ধারা আসিয়া বাঙ্গালীর চিত্তকে প্লাবিত করিয়া দিল, বাঙ্গালী নিজ ভাষায় নিজের নূতন

আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখকে প্রকাশ করিতে চাহিল। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত নূতন করিয়া পরিচয় বাঙ্গালীকে তাহার সংস্কৃতির বনিয়াদ ও ভাষার উন্নতি বিধানে নূতন শক্তি দিল। আমরা এখনও অনেকটা এই যুগের-ই জোয়ার মধ্যে আছি। উনবিংশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ কিছু ফলপ্রদ হয় নাই—এই সময়টা ছিল প্রস্তুত হওনের যুগ। রাজা রামমোহন রায় (? ১৭৭৪-১৮৩৩) প্রমুখ দুই চারিজন মনীষী আধুনিক বা ইউরোপীয় শিক্ষার আবশ্যকতা ও অবশ্যম্ভাবিতা উপলব্ধি করিয়া, বাঙ্গালীকে তদ্বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সভ্যতার এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মূল-স্বরূপ আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের (বিশেষতঃ উপনিষদ্ ও বেদান্ত-দর্শনের) আলোচনা করিতে উপদেশ দিলেন। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুগোপযোগী সংস্কার, সমগ্র মানব-জগতের সহিত সংযোগ, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের সংরক্ষণ—এই-সমস্ত বিষয়ে রামমোহন রায় ভারতবাসীদের নূতন পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। মুসলমান ধর্মের প্রভাবে কতকগুলি অনুষ্ঠানিক ধর্ম (যেমন 'পৌত্তলিকতা-বর্জন') সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রচলিত হিন্দু মতবাদ ও অনুষ্ঠান হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার ফলে ক্রমে 'ব্রাহ্ম-সমাজ' প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় এবং হিন্দু বলিয়া রামমোহন রায়ের গৌরব; তিনি এই যুগের একজন প্রধান চিন্তা-নেতা ছিলেন।

নবীন যুগের ভাব-প্রকাশের উপযোগী গদ্য ভাষা গড়িয়া তুলিতেই উনবিংশ শতকের গোড়ায় দুই-তিন দশক অতিবাহিত হইয়া গেল। নূতন ভাব ও নূতন ভাষা, উভয়কে আনিতে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া Carey কেরি, Marshman মার্শ্‌ম্যান্, Ward ওয়ার্ড্-প্রমুখ শ্রীরামপুরের প্রোটেস্টান্ট্-মতের খ্রীষ্টান মিশনারিগণ বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতা-ভাজন ও নমস্য

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের স্রষ্টাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের

সঙ্গে সঙ্গে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইঁহার জীবৎকাল ১৭৮৭-১৮৪৮। ইনি আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রথম ও প্রধান লেখক। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইনি 'নব-বাবুবিলাস' (১৮২৫), 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) প্রভৃতি কতকগুলি গদ্য পুস্তক রচনা করেন, এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রের সম্পাদকতা করেন। রামমোহন রায়-প্রমুখ সংস্কারকগণের সহিত একমত না হইয়া, ইনি হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সংরক্ষণে যত্নবান্ হইয়া 'ধর্মসভা' স্থাপন করেন, এবং 'শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ', 'মনুসংহিতা', 'ভগবদ্গীতা' প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থ মূল ও টীকার সহিত মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করেন। (বাঙ্গালীর মানসিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারণে ভবানীচরণের কৃতিত্বের গৌরব এখন সাধারণ বাঙ্গালীর নিকটে প্রায় অজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছিল; শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণের চেষ্টায় ইঁহার রচনাবলীর পুনঃপ্রকাশ হইয়াছে ও এগুলির আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

প্রথমটায় উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে যে গদ্য ভাষা দাঁড়াইল তাহা কঠিন সংস্কৃত শব্দের ভারে চলিতে অক্ষম, এবং বাক্য-রীতিতে আড়ষ্ট, কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), ও বিশেষ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রমুখ কয়েকজন গদ্য লেখকের হাতে বাঙ্গালা ভাষার গদ্য-শৈলী অপূর্ব প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট হইয়া উঠিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গালাদেশের নবীন যুগের একজন প্রবর্তক। হিন্দু বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ প্রমাণ করিয়া তিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু বিধবা-বিবাহকে আইনের সমক্ষে গ্রাহ্য করাইতে সমর্থ হন। 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা', 'সংস্কৃত ব্যাকরণ কৌমুদী' ও সংস্কৃত পাঠাবলী 'ঋজুপাঠ' প্রণয়ন করিয়া তিনি এদেশে সংস্কৃত শিক্ষায় যুগান্তর আনয়ন করেন এই বইগুলির দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফৎ বাঙ্গালী শিক্ষিত জনগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রচার বিশেষ ভাবে ঘটে, ও তাহার ফলে ইংরেজী শিক্ষিত লেখকগণের হাতে

বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব নূতন করিয়া আসিতে থাকে। তিনি হিন্দী, সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্য হইতে অতি উৎকৃষ্ট কতকগুলি বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন—‘বেতাল-পঞ্চবিংশতি’ (১৮৪৭), ‘সীতার বনবাস’ (১৮৬২) ও ‘ভ্রান্তিবিলাস’ (১৮৭০)। আধুনিক বাঙ্গালা সাধু গদ্যের ধারার প্রবর্তন কার্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্বই আমরা বেশী করিয়া দেখিতে পাই; এই জন্য ইঁহাকে ‘বাঙ্গালা গদ্যের জন্মদাতা’ বলা হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগরের ভাষা সহজ ও সরল, এই ভাষায় বাক্য রচনায় বিচার-শক্তির প্রয়োগ দেখা যায়; ইহার শব্দ-সম্ভার মুখ্যতঃ সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইলেও, শুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দের সার্থক প্রয়োগ এই ভাষার শক্তির অন্যতম কারণ রূপে বিদ্যমান।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে পূর্ব যুগের শেষ কবি বলা যায় (১৮১২-১৮৫৯)। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ বলা চলে। তখন শৈশব ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া নবীন বাঙ্গালা সাহিত্য যৌবনলাভ করিয়াছে। ইউরোপীয় বা আধুনিক ভাবের সাহিত্য-ধর্মকে সম্যক্ বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এমন কতকগুলি কবি ও গদ্যলেখক দেখা দিলেন; এবং বাঙ্গালা সাহিত্য যে নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই পথে ইঁহারা তাহার কর্ণধার হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান দুইজন— কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) এবং ঔপন্যাসিক ও নিবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। ইঁহাদের নামে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগকে ‘মধুসূদন-বঙ্কিমের যুগ’ বলা যাইতে পারে। মধুসূদনের কীর্তি—তিনি নিজ প্রতিভা ও বিদ্যা বলে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যকে নূতন জগতে প্রবেশ করান, নূতন ছন্দ এবং কবিতার রূপ (অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেট) বঙ্গভাষায় ব্যবহার করেন, এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের রীতি বঙ্গভাষার মধ্যে অতি কৃতিত্বের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন; কিন্তু তাঁহার কাব্যের বিদেশীয় রূপের অন্তস্তলে বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির ও প্রাণের সহিত এক গভীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক সহানুভূতি ও সংযোগ প্রবাহিত।

তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০), 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' (১৮৬১), 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বাঙ্গালা ভাষায় অমর হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা নাটকও তাঁহার হাতে উৎকর্ষ-লাভ করে; বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথের পূর্বেকার সময়ের শ্রেষ্ঠ লেখক বলা যায়, ইঁহার উপন্যাসগুলি ভারতীয় সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। বাঙ্গালা সাধু-ভাষায় গদ্য-রচনা বঙ্কিমের লেখনীতে চরম উন্নতি-শিখরে আরোহণ করে। বঙ্কিমের পূর্বে প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) নামে একখানি পারিবারিক ঘটনা-সংবলিত গল্প লেখেন; এই বই ভাষার প্রাঞ্জলতায় এবং বর্ণনার সরসতায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বাঙ্গালা গদ্যের কতটা শক্তি আছে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম দেখাইলেন; বাঙ্গালী জাতি আর কিছুর জন্য না হউক, এই জন্য ইঁহার কাছে ঋণী থাকিবে। এতদ্ভিন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে বাঙ্গালী সমাজের সত্যকার চিত্র অঙ্কন করিলেন, এবং ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অতীত গৌরব-বোধ, জাতির জীবনের সঙ্গে গভীর সমবেদনা, জাতির সংস্কৃতির মূলে কি শক্তি আছে তাহা বুঝিয়া নিজেদের চালিত করা, বিশ্বের সমক্ষে ভারতবর্ষকে আবার বড় করিয়া তুলিয়া ধরা—এই সব বিষয়ে বাঙ্গালীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে তিনি তাঁহার উপন্যাসে ও নিবন্ধে মূর্ত করিয়া তুলিলেন। ঐতিহাসিক বোধ এবং যুক্তিতর্কানুযায়িতা—মানসিক উৎকর্ষের পক্ষে এই দুই অপরিহার্য অঙ্গ—বঙ্কিমচন্দ্র সার্থক ভাবে বাঙ্গালীকে শিখাইয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতকের বাঙ্গালার তথা ভারতের, ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ও তৎসঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় আস্থাশীল চিত্তের প্রতীক বঙ্কিমচন্দ্র দেশ-প্রীতির ও দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে তাঁহার লেখনী-গ্রহণ সার্থক হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশের এবং তৎসঙ্গে ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র যে একজন প্রধান, তাহা বাঙ্গালী জাতি ও অন্য ভারতবাসী মানিয়া লইয়াছে। বঙ্কিমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুগামী আর একজন মহাত্মার নাম করিতে হয়—স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। হিন্দুদর্শন ও হিন্দুধর্ম-প্রচারের মধ্য দিয়া

ইনি ভারতীয় জনগণের আত্মচেতনাকে ও আত্মবিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের চেষ্টার ফলে আধুনিক ভারতের মানসিক প্রগতি বিশেষ শক্তি অর্জন করিয়াছে। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ও ভারতের জনগণের সহিত প্রগাঢ় সহানুভূতিতে পূর্ণ ইঁহার অপূর্ব শক্তিশালী রচনা বাঙ্গালা ভাষার এক বিশিষ্ট সম্পদ।

মধুসূদন ও বঙ্কিমের যুগের বহু লেখকের মধ্যে এই কয়জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি উল্লেখযোগ্য :—[১] রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)। ইনি রাজপুত ইতিহাসের কতকগুলি গৌরবময় কাহিনী আহরণ করিয়া অতি প্রাঞ্জল ও শক্তিশালী ভাষায় কাব্য রচনা করেন—পদ্মিনী, কর্মদেবী ও শূরসুন্দরী, এবং উড়িষ্যার একটী মনোহর ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে কাঞ্চী-কাবেরী কাব্য। এই সব কাব্যে আমরা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ছায়াপাত দেখিতে পাই। রঙ্গলালের বর্ণনা-শক্তি অসাধারণ ছিল। রাজপুত জাতির বিশেষ গুণগ্রাহী Colonel James Tod কর্ণেল জেমস টড্, রাজপুত জাতির ইতিহাস লিখিয়া Annals and Antiquities of Rajasthan নামে ১৮২৯ সালে বিলাত হইতে প্রকাশিত করেন। এই বই ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকটে নূতন একটী জগতের খবর দিল—এদেশে মহাভারত-রামায়ণের পাশেই যেন বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত 'রাজস্থান' গ্রন্থ স্থান পাইল। রাজপুতানার হিন্দু বীর ও বীরাঙ্গনাগণের লোকোত্তর চরিত্রের মহিমা বাঙ্গালীর চিত্তকে জয় করিল। আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য, নাটক ও উপন্যাসের ক্ষেত্রের অনেকটা অংশ এই 'রাজস্থান' গ্রন্থেরই প্রভাবের ফল। রঙ্গলালের রচিত রাজস্থানের আখ্যানমূলক তিনটী কাব্য বাঙ্গালীর কাছে দেশাত্মবোধ, স্বাজাত্য ও ত্যাগের বাণী লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। [২] দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)—বঙ্কিমের অন্তরঙ্গ বন্ধু, নাট্যকার; ইঁহার কতকগুলি হাস্যরসাত্মক নাটক বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত; ইনি কবিও ছিলেন। [৩] রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১)—বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক, পণ্ডিত ও গ্রন্থ-লেখক। গত শতাব্দীতে

বাঙ্গালী এবং অন্য ভারতবাসীকে উঁহার প্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতির সহিত পরিচিত করিতে ইনি বিশেষ চেষ্টিত হন। ইংরেজী ও বাঙ্গালায় নিবন্ধ গবেষণাময় বহু পুস্তক ব্যতীত, ইনি সাধারণের শিক্ষাকল্পে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে একখানি বিশেষ উপযোগী পত্রিকা প্রকাশ করেন। [৪] ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪)—শিক্ষাব্রতী ও নিবন্ধকার। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও চারিত্রিক ঐক্য আধুনিক সভ্যতার সহিত যাহাতে তাল রাখিয়া চলিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহার নানা প্রবন্ধে ও পুস্তকে তিনি চেষ্টিত ছিলেন। হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু আদর্শের সংরক্ষকগণের মধ্যে ইনি অন্যতম ছিলেন; বাঙ্গালার একজন প্রধান উদারনৈতিক লেখক ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। [৫] বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)—বাঙ্গালা কবিতায় ইনি নূতন ধরণের কল্পনাশক্তি ও ছন্দের ঝঙ্কার প্রদর্শন করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইঁহার প্রভাব মানিয়াছেন। [৬] হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)—মধুসূদনের অনুপ্রেরণায় 'বৃত্র-সংহার' কাব্য লেখেন, এবং কবিতায় স্বদেশ-প্রীতি প্রচার করেন। [৭] নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) ইনিও হেমচন্দ্রের মত মধুসূদনের অনুকরণে কতকগুলি বড় বড় কাব্য-গ্রন্থ লেখেন ('কুরুক্ষেত্র', 'রৈবতক', 'প্রভাস'), এতদ্ভিন্ন ঐতিহাসিক কাব্য 'পলাশীর যুদ্ধ', এবং বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে আরও তিনখানি কাব্য ('অমিতাভ', 'খ্রীষ্ট', 'অমৃতাভ') প্রণয়ন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত আত্মজীবনী ('আমার জীবন') মানবচরিত্র ও সমসাময়িক ঘটনাবলী-সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব প্রকাশক এক উপাদেয় গ্রন্থ। [৮] রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)—ভারতীয় সভ্যতার ঐতিহাসিক, ঋগ্বেদের বাঙ্গালা অনুবাদক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসিক—এই যুগের বাঙ্গালীর মানসিক সংস্কৃতির একজন নেতা ছিলেন, উপন্যাস রচনায় ইনি বঙ্কিমচন্দ্রেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মাধবী-কঙ্কণ', 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত', এবং সামাজিক উপন্যাস 'সংসার' ও 'সমাজ'

সুপরিচিত পুস্তক। রমেশচন্দ্র ইংরেজীতে লিখিয়াও বিলাতে যশস্বী হইয়াছিলেন। [৯] গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১)—বঙ্গভাষার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাট্যকার—প্রায় ৯০খানি বড় নাটক ও নক্সা এবং প্রহসন লিখিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে 'বিল্বমঙ্গল', 'প্রফুল্ল' 'জনা', 'পাণ্ডব-গৌরব', 'বুদ্ধদেব-চরিত', 'চৈতন্যলীলা', 'নিমাই-সন্ন্যাস', 'সিরাজদ্দৌলা', 'অশোক' প্রভৃতি অনেকগুলিই বাঙ্গালা নাট্য সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুস্তক। অমর কবি উইলিয়ম শেকস্পিয়র-এর 'ম্যাক্‌বেথ্‌' নাটকের গিরিশচন্দ্রের কৃত অনুবাদটী বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বর্ধন করিয়াছে। গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলি ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত, কতকগুলি নাটকে তিনি সমাজের কথা বলিয়াছেন, এবং কতকগুলি ঐতিহাসিক নাটকে দেশাত্মবোধ প্রচার করিয়াছেন। [১০] অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)—এই যুগের শেষ প্রহসন ও হাস্যরসাত্মক সামাজিক নাটক রচয়িতা ছিলেন। ইঁহার ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মধ্যে একটী অপরিমিত আদর্শবাদ লক্ষণীয়—বাঙ্গালার জাতীয়তা ইঁহার নিকট সর্বদা রক্ষণীয় বস্তু ছিল। [১১] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)—ঐতিহাসিক, ঔপন্যাসিক ও নিবন্ধকার—ইনি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ভারতের ইতিহাস-কথা ও কতকগুলি মৌলিক উপন্যাস লিপিবদ্ধ করিয়া যান; মধুসূদন-বঙ্কিমের যুগ ও রবীন্দ্র-যুগ, এই উভয় ব্যাপিয়া ইঁহার সাহিত্যিক জীবন ছিল।

মধুসূদন ও বঙ্কিমের যুগে এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কবি ও অন্য লেখক উদ্ভূত হন। এই যুগে ইঁহাদের সকলের হাতে নবীন বাঙ্গালীর মনের কাঠামো গড়িয়া উঠিল, শিক্ষিত বাঙ্গালী জীবনের অনেক অংশে নিজেকে দেখিতে ও জানিতে সমর্থ হইলেন। ইঁহাদের যুগের প্রসার ঊনবিংশ শতকের শেষ বা বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত (স্বদেশী আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত) ধরা যায়।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্তমান বা তৃতীয় যুগকে, রবীন্দ্রনাথের মহান্ মানসিক ও নৈতিক প্রভাব-দ্বারা প্রভাবিত বলিয়া বর্ণনা করিতে পারা যায়, যদিও পূর্ব যুগের মধুসূদন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দের প্রভাব হইতে এই যুগ একেবারে

মুক্ত হয় নাই—তাঁহাদের চিন্তাধারা ও শক্তি এখনও কার্য করিতেছে। ভারত ভাস্কর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালেই কবিতা ও অন্য রচনায় উদীয়মান লেখকদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা শীঘ্রই স্বদেশে স্বীকৃত হইয়াছিল, এবং এ কথা এক্ষণে সকলেই অল্প-বিস্তর মানিয়া লইয়াছেন যে, এই যুগে পৃথিবীর তাবৎ কবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আসন সর্বোচ্চে। ইউরোপ এবং আমেরিকা তথা এশিয়ার দেশগুলিও তাঁহার মর্যাদা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, তাঁহাকে কবিসম্রাট বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, এবং জগতের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নেতা বলিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান দিয়া জগতের তাবৎ সভ্যজাতি আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্র-নাথের প্রতিভা ছিল অদ্ভুতভাবে সর্বতোমুখী। কাব্য, নাটক, ছোট গল্প, উপন্যাস সব বিষয়ে তিনি নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কার করিয়া তাঁহার চমৎকৃত ও প্রীত দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। ভাষায় ও ভাবে লোকোত্তর শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রকাশ তাঁহার রচনায় দেখা যায়, সেই জন্য কবি রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ-রূপে 'বাক্‌পতি' আখ্যা দেওয়া যায়। ১৯১১ সালে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়, তাঁহার স্বদেশবাসিগণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রমুখাৎ তাঁহার সংবর্ধনা করেন; তাঁহার পূর্বেকার কোনও লেখকের এরূপ সংবর্ধনা বাঙ্গালা দেশ কখনও করিতে পারে নাই। ১৯১৩ সালে ইংরেজীতে তাঁহার নিজের অনূদিত 'গীতাঞ্জলি' পুস্তকের জন্য সুইডেন হইতে তিনি নোবেল-পুরস্কার পান, এবং ইহার দ্বারা তিনি ভারতবর্ষের বাহিরে সমগ্র সভ্য জগতের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহার পরে ক্রমশঃ সমস্ত জগৎ তাঁহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের কাব্য, প্রবন্ধ ও উপন্যাসের অনুবাদ জগতের প্রায় সমস্ত সভ্য ভাষায় বাহির হইয়াছে। তাঁহার কৃতিত্বের ফলেই বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য এবং আধুনিক ভারতবর্ষ পৃথিবীর সমক্ষে এতটা উন্নীত হইয়াছে। ১৯৪১ সালে তাঁহার তিরোধান বঙ্গদেশ তথা ভারতের পক্ষে অনপনেয় দুর্ভাগ্যের বিষয় হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার মত শক্তিশালী লেখক এখন বাঙ্গালায় কেহ নাই। বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরকে বিশেষভাবে 'রবীন্দ্রের যুগ' বলিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ও অনুবর্তী বহু কবি, ঔপন্যাসিক ও অন্য লেখক বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলিত করিতে পারা যায় না,—কেবল সংক্ষেপে কতকগুলি নাম করিতে পারা যায়—অক্ষয়কুমার বড়াল (কবি—১৮৬৫-১৯১৮), দেবেন্দ্রনাথ সেন (কবি—১৮৫৫-১৯২০), রজনীকান্ত সেন (কবি ১৮৬৫-১৯১০), কামিনী রায় (কবি—১৮৬৪-১৯৩৩), স্বর্ণকুমারী দেবী (ঔপন্যাসিক—১৮৫৫-১৯৩২), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (নিবন্ধকার, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক—১৮৬৪-১৯১৯), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (কবি—১৮৮২-১৯২২), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ঔপন্যাসিক—১৮৭৩-১৯৩২), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (কবি ও নাট্যকার—১৮৬৩-১৯১৩), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক-উপন্যাস-লেখক—১৮৮৪-১৯৩০) এবং হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (দার্শনিক ও নিবন্ধকার—১৮৬৮-১৯৪২)। ইঁহারা ছাড়া আরও অনেক উৎকৃষ্ট লেখক গত ৩০ ৪০ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই যুগের লেখকদের মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার যোগ্য—ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)। ইঁহার উপন্যাসে সামাজিক ও অন্য অত্যাচারে পিষ্ট ও ক্লিষ্ট বাঙ্গালার জনগণ যেন নূতন ভাষা পাইয়াছে—ইনি সত্য-নিষ্ঠার সঙ্গে বাঙ্গালীর জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এবং যে অন্যায়, অবিচার ও দৌর্বল্য তিনি দেখিয়াছেন, মর্মস্পর্শী সারল্যের সহিত তাহা সকলের দৃষ্টির সমক্ষে ধরিয়াছেন। তবে ইনি সমাজের নানা জটিল সমস্যার সমাধানের দিকে বিশেষ কিছু বলেন নাই—অপূর্ব শক্তি ও নিপুণতার সহিত সমস্যাগুলিকে কতক অংশে বিশদ করিয়া দেখাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন মাত্র। এই আত্মপরীক্ষার আকাঙ্ক্ষা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে, বিশেষতঃ তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম যুগে লেখা উপন্যাসে, যেরূপ

ভাবে প্রকটিত হইয়াছে, সেইরূপ অতি অল্পসংখ্যক উপন্যাসেই করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আধুনিক সাহিত্যের এই তৃতীয় যুগে, বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্যের ভাষার আড়ষ্ট ভাবকে একেবারে বর্জন করিয়া মৌখিক ভাষার অনুসারী হইয়া উঠিয়াছে, ইহার মজ্জাগত শক্তি এখন নানা ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। কলিকাতার মৌখিক ভাষা এখন সাহিত্যে বহুশঃ ব্যবহৃত হইতেছে। এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০); ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার লোক-ভাষায় ইহার 'হুতোম পেঁচার নকশা' প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহার একটা কুফল দাঁড়াইতেছে—কলিকাতার মৌখিক ভাষা ভালরূপে না জানিয়া কতকগুলি লেখক ভাষায় নানা প্রকারের অশোভন গ্রাম্যতা ও অরাজকতা আনিতেছেন।

অধুনা বাঙ্গালাভাষীদের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানগণের সংখ্যা অধিক হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্য মুখ্যতঃ হিন্দুভাবে অনুপ্রাণিত সাহিত্য। ইহার কারণ, বাঙ্গালার মুসলমানগণ প্রধানতঃ বাঙ্গালার প্রাচীন হিন্দু (ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ) জনগণেরই বংশধর বলিয়া, তাহাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট-হইতে জন্ম-গত অধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত মানসিক প্রকৃতি এবং সংস্কৃতি-গত জীবনই এখনও তাহাদের মধ্যে বলবৎ ভাবে কার্যকর হইয়া আছে। যাহাদের সহিত রক্তের সম্পর্ক, সেই হিন্দুদিগ-হইতে মনে প্রাণে এবং সংস্কৃতি-গত জীবনে বিশেষ পার্থক্য আসে নাই। বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য তাই বাঙ্গালার সার্বজনীন সাহিত্য হইয়া আছে। অল্পসংখ্যক বিদেশী তুর্কী, ইরানী, পাঠান ও পশ্চিমা মুসলমান বাঙ্গালাদেশে ধর্মান্তরিত বাঙ্গালী মুসলমানগণের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে—বাঙ্গালা দেশে মুসলমান যুগেও একটা লক্ষণীয় "বাঙ্গালী মুসলমান" সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আরবীর চর্চা এদেশে খুব কম ছিল, এবং রাজভাষা বলিয়া হিন্দুরাও ফারসীর চর্চা করিত। আরবী ফারসীর প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে তেমন করিয়া পড়ে নাই। কেবল কতকগুলি আরবী

ফারসী উপাখ্যান বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছিল মাত্র, এবং বাঙ্গালী মুসলমানদের উপযোগী অনুষ্ঠান ও নিত্য-কর্ম তথা মুসলমান ধর্ম-মত সম্বন্ধে কতকগুলি পুস্তক লিখিত হয় মাত্র; এতদ্ভিন্ন, মুসলমান সূফী দর্শনের প্রভাব, পরোক্ষভাবে, ও প্রত্যক্ষভাবে ফারসী সাহিত্যের মধ্য দিয়া, মুসলমান যুগে শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মধ্যে কিছু পরিমাণে কার্যকর হইয়াছিল। শুদ্ধ বাঙ্গালী ভাবধারা বজায় রাখিয়া বাঙ্গালী মুসলমান চিত্তের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছিল মুসলমান 'বাউল' ও 'মারফতী' গানে। 'শাহ্‌নামা, সিকন্দরনামা' প্রভৃতি পারস্যের ইতিহাস-কাব্য ও কথা-সাহিত্য, এবং আরবের কথা-সাহিত্য, তথা কারবালার যুদ্ধ প্রভৃতি আরব ইসলামের প্রথম যুগের কাহিনী, পয়ারাদি ছন্দে রচিত হইয়া মুসলমান বাঙ্গালার 'পুঁথি-সাহিত্য' নামে, হিন্দুদের 'রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতির পার্শ্বে স্থান পাইয়া, বাঙ্গালী মুসলমান জনগণের চিত্তকে সরস করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আরব ও পারস্যের এই বিশাল কাব্য- ও কথা-সাহিত্য, বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প কয়জন উচ্চ শ্রেণীর ও মার্জিত রুচির কবির দ্বারা উচ্চ কোটির সাহিত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আরবী ও ফারসী সাহিত্যের ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়া শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান যে আনন্দ ও শিক্ষা পান, বাঙ্গালা মুসলমান 'পুঁথি সাহিত্য' মধ্যে তাহার অক্ষম অনুসরণ পাঠে সে শিক্ষা ও আনন্দ পান না। অধুনা বাঙ্গালার শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে আরব, পারস্য ও উত্তর-ভারতের মুসলমান সংস্কৃতির প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আসার ফলে, মুসলমান ভাবে অনুপ্রাণিত এক নবীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টির দিকে কতকগুলি মুসলমান লেখক আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। এই চেষ্টার ফলে, মুসলমান চিন্তাধারার অনুগামী কিছু কিছু আরবী ফারসী শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলনও অবশ্যম্ভাবী; এবং আশা করা যায়, শক্তিশালী লেখকের হাতে বাঙ্গালা সাহিত্য, আরবী, ফারসী ও উর্দূ হইতে আহৃত ভাবধারাতেও পুষ্ট হইবে,—এবং আরবের ও ভারতের বাহিরের মুসলমান সংস্কৃতি এবং বাঙ্গালী মুসলমানের জীবন ও ভাবধারা আশ্রয় করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের একটী নূতন

দিক্ আবিষ্কৃত হইবে, যাহা হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর চিত্তের রসায়ন-স্বরূপ হইবে।

বাঙ্গালার সাহিত্য উত্তরোত্তর প্রবর্ধমান, বাহিরের দিক্ হইতে দেখিলে, এই সাহিত্যের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু একটা গুরুতর আশঙ্কার কথা আছে। জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হয় জাতীয় সাহিত্যে। সেই জীবনে যখন সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তি থাকে, জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা যখন স্বাভাবিক থাকে, তখন-ই যে সাহিত্যে জীবন প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত হয়, সেই সাহিত্য প্রাণবান্ ও সারবান্ এবং চিরন্তন সত্যের আধার হইয়া উঠে। কিন্তু যেখানে জীবন-যাত্রা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, দেশের জনগণের আত্মিক শক্তির হ্রাস ঘটে,— জাতির মধ্যে যেখানে অনৈক্য, ভাববিরোধ, ও আত্ম-কলহ আসিয়া যায়, সেখানে সাহিত্য কিছুতেই শক্তিশালী বা জীবন্ত, সারবান্ বা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নানা দিক্ দিয়া হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আজকাল বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রাণশক্তি আর অটুট থাকিতেছে না, ইহাতে তাহার মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী, এবং তাহার আধুনিক সাহিত্যিক প্রচেষ্টা কেবল ভস্মে ঘী ঢালার ন্যায় বিফল হইবে, তাহার সাহিত্যিক পূর্ব গৌরব অতীতের বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে, ভবিষ্যৎ গৌরবে তাহার অতীত গৌরবের পরিণতি ঘটিবে না। বাঙ্গালী জাতি বড় না হইলে, পার্থিব ও অপার্থিব জগতে শক্তিশালী না হইলে, আত্মিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন না হইলে, বাঙ্গালার সাহিত্য বড় থাকিতে পারিবে না। এ বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান, প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর দায়িত্ব আছে — তাহার নিজের প্রতি তাহার পিতৃপুরুষগণের প্রতি, এবং তাহার ভবিষ্যদ্বংশধরগণের প্রতি।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের কতকগুলি প্রধান প্রধান তারিখ

৩০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ	আনুমানিক	মৌর্যবিজয়, বাঙ্গালাদেশে আর্য-ভাষার প্রসার।
৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ		বাঙ্গালাদেশে গুপ্তসম্রাট্‌গণের অধিকার এবং দেশে উত্তর-ভারতের সভ্যতার প্রসার।
? ৪০০ ,,		চন্দ্রবর্মার সুসুনিয়া শিলালেখ
৭৫০ ,,	(আনুমানিক)	পাল-রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা।
১০৩৮ ,,	,,	দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান-অতীশ, বঙ্গদেশীয় বৌদ্ধ আচার্য।
১১১০ ,,	,,	মহারাজ বল্লাল সেন।
১১৮০ ,,	,,	জয়দেব কবি; মহারাজ লক্ষ্মণসেন।
১২০০		বিদেশীয় মুসলমান তুর্কীগণ কর্তৃক বঙ্গদেশ-বিজয়ের সূত্রপাত।
১৪০০ ,,	,,	বড়ু-চণ্ডীদাসের জীবৎকাল (?)—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ।
১৪০০ ,,	,,	মৈথিল কবি বিদ্যাপতির জীবৎকাল।
১৪১৮ ,,	,,	রাজা কংস (দনুজমর্দনদেব)।
১৪২০ ,,	,,	কৃত্তিবাসের জীবৎকাল।
১৪৮০ ,,	,,	মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ)।
১৪৯২ ,,	,,	বিপ্রদাস চক্রবর্তী ('মনসামঙ্গল')।
১৪৯৪ ,,	,,	বিজয় গুপ্ত, 'পদ্মাপুরাণ'
১৪৮৬-১৫৩৩	খ্রীষ্টাব্দ	চৈতন্যদেবের জীবৎকাল।

১৪৯৩-১৫১৯		খ্রীষ্টাব্দ	হোসেন শাহ্, বাঙ্গালার সুলতান।
১৫১৭		"	পোর্তুগীসদিগের প্রথম বঙ্গে আগমন।
১৫২৬		"	উত্তর-হিন্দুস্থানে বাবর কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্য-স্থাপন।
১৫৪০	খ্রীষ্টাব্দ	(আনুমানিক)	বৃন্দাবনে বাঙ্গালী বৈষ্ণব-গোস্বামিগণের প্রতিষ্ঠা।
১৫৭৫	"		বঙ্গে মোগল-অধিকার।
১৫৮০	"	(আনুমানিক)	কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
১৬০০	"	"	কাশীরাম দাস।
১৬৫০	"	"	চট্টলে আলাওল প্রমুখ মুসলমান কবিগণ।

১৬৫১ ইংরেজদের প্রথম বঙ্গে আগমন

১৬৯১ " কলিকাতায় ইংরেজদের বাস।

১৭০০ মাণিক গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গল'

১৭১১ " ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল'।

১৭৪৩ " বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক, রোমান অক্ষরে লিস্‌বনে ছাপা পোর্তুগীস পাদ্রি আসসুম্প্‌সাঁও (Padre Assumpçaõ)-এর বই।

১৭৫০ " রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের জীবৎকাল।

১৭৫৭ " পলাশীর যুদ্ধ।

১৭৬০ " কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যু।

১৭৬৫ " নবাব মীর কাসিমের পরাজয়ের পরে শাহ্ আলম বাদশাহের নিকট হইতে 'ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী' কর্তৃক বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় দেওয়ানী লাভ।

১৭৭৮	খ্রীষ্টাব্দ	হাল্‌হেড্ (Halhed)-কৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ,—বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম মুদ্রণ।
১৭৯৩	„	আপ্‌জন (Upjohn) কর্তৃক প্রকাশিত 'ইংরাজি ও বাঙ্গালা বোকেবিলারি'।
১৭৯৯-১৮০২	„	ফরস্টার (Forster)-কৃত ইংরেজী-বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা-ইংরেজী অভিধান।
১৮০০	„	কলিকাতায় 'ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ' প্রতিষ্ঠা।
১৮০১	„	কেরি (Carey)-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ (ইংরেজীতে)।
১৮০৩		শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ কর্তৃক কৃত্তিবাসের রামায়ণ মুদ্রণ।
১৮১৬	„	'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা।
১৮১৭	„	রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ-সঙ্কলিত 'বঙ্গভাষাভিধান'।
১৮১৮	„	প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র—'সমাচার দর্পণ' (J. C. Marshman মার্শ্‌ম্যান, ব্যাপ্টিস্ট্ মিশন, শ্রীরামপুর)। বাঙ্গালী-পরিচালিত প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাঙ্গালা গেজেট'।
১৮২০	„	রাধাকান্ত দেব রচিত ও প্রকাশিত 'বাঙ্গালা শিক্ষক' (বর্ণমালা ও প্রথম পাঠ)।
১৮২৫	„	কেরি (William Carey)-কৃত বাঙ্গালা অভিধান।
১৮২৬	„	রামমোহন রায়-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ (বাঙ্গালা সংস্করণ, ১৮৩৩)।
১৮৩০	„	ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা।
১৮৩৩	„	হটন (Haughton)-কৃত বাঙ্গালা-ইংরেজী অভিধান।
১৮৩৪	„	রামকমল সেন-কৃত ইংরেজী বাঙ্গালা অভিধান।

১৮৩৮	খ্রীষ্টাব্দ	আদালতে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীর প্রচলন
১৮৪৭	,,	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-কৃত 'বেতালপঞ্চবিংশতি'।
১৮৫০	,,	শ্যামাচরণ সরকার-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ (ইংরেজীতে)।
১৮৫৭	,,	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
১৮৫৮		প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর)-রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' (উপন্যাস)।
১৮৬১	,,	মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'।
১৮৬২	,,	কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নক্‌শা'
১৮৬৫	,,	বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস—'দুর্গেশনন্দিনী'।
১৮৭২	,,	বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ।
১৮৭২-১৮৭৯	,,	বীম্‌স (Beames) কৃত আধুনিক আর্যভাষাগুলির তুলনাত্মক ব্যাকরণ।
১৮৭৭	,,	রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর-কৃত তুলনাত্মক ব্যাকরণ
১৮৮০	,,	হ্যরন্‌লে (Hoernle)-কৃত আধুনিক আর্যভাষার তুলনাত্মক ব্যাকরণ।
১৮৯৩	,,	বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা
১৮৯৪-১৮৯৬	,,	গ্রিয়ার্সন (Grierson)-কৃত আধুনিক আর্যভাষার তুলনাত্মক ব্যাকরণের প্রারম্ভ।
১৯০৩	,,	গ্রিয়ার্সন (Grierson) কৃত Linguistic Survey of India-র পত্তন—বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক প্রথম খণ্ড।
১৯০৫	,,	বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন।
১৯০৮	,,	বি এ. পরীক্ষা পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য আবশ্যিক পাঠ্য-বিষয় রূপে নির্ধারিত

১৯১১	খ্রীষ্টাব্দ	বঙ্গ-ভঙ্গ রদ — ভারতের রাজধানী কলিকাতার পরিবর্তে দিল্লী।
১৯১৩		রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পারিতোষিক প্রাপ্তি
১৯১৬	,,	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক 'চর্যাপদ' ('বৌদ্ধগান ও দোহা') প্রকাশ।
১৯১৭	,,	শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশ
১৯১৭	,,	জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা অভিধান, (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ)।
১৯৪০	,,	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ।
১৯৪১	,,	রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু।

মহাপ্রাণ বর্ণ

এই প্রবন্ধে চৌকা বন্ধনীর [ ] মধ্যে যে রোমান অক্ষরে ও রোমানের আধারে প্রস্তুত নূতন অক্ষরে বাঙ্গালা ও অন্য ধ্বনিগুলি লিখিত হইয়াছে, সেই অক্ষরগুলি International Phonetic Association-এর বর্ণমালার। অক্ষরগুলি কোন্ কোন ধ্বনির প্রতীক, তাহা নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে :—

ː = স্বরধ্বনির দীর্ঘতা-জ্ঞাপক «তারা» [tara], «তার» [taːr]

˜ = সানুনাসিকতা-জ্ঞাপক «বাস» [baːʃ], «বাঁশ» [bãːʃ].

ɑ = সাধারণ বাঙ্গালা আ-কারের ধ্বনি «রাম» = [rɑm].

a = পূর্ব-বঙ্গের «কা'ল» (কল্য)-তে যে আ-কারের ধ্বনি মিলে; যথা— «কাল» (= সময়, মৃত্যু, কৃষ্ণবর্ণ) = [kɑːl], কিন্তু «কা'ল» (= কল্য) = [kaːl] («কা'ল, কাইল» = [kaˑl, kail] হইতে)।

æ = পশ্চিম-বঙ্গের «এক, ত্যাগ, প্যাঁচা» প্রভৃতি শব্দের স্বরধ্বনি [æːk, tæːg, pæ̃cja]।

b = ব; c = প্রাচীন আর্য্যভাষার (বৈদিকের) চ-কারের ধ্বনি, কতকটা ক্য = ky-র মত শোনায়, শুদ্ধ plosive বা stop অর্থাৎ স্পৃষ্ট ধ্বনি—তালব্য অঘোষ অল্পপ্রাণ, ch = বৈদিক «ছ»।

cj = পশ্চিম-বাঙ্গালার «চ»-এর ধ্বনি—তালব্য অঘোষ অল্প-প্রাণ affricate অর্থাৎ ঘৃষ্ট, cjh = পশ্চিম বাঙ্গালার «ছ» = chh।

ç = জর্ম্মান ich শব্দের ch-এর ধ্বনি = বৈদিক «শ»।

d = দ; ḍ = ড, dh = ধ, ḍh = ঢ; ɗ = ইংরেজী d, দন্তমূলীয়, dʔ = পূর্ব বঙ্গের «ধ», ḍʔ = পূর্ব-বঙ্গের «ঢ»

e = পশ্চিম-বঙ্গের এ-কার, «দেশ, খেত, কেবল» = [deːʃ, kheːt, kebol]; ɛ = পূর্ব-বঙ্গের এ-কার—[dɛˑʃ, khɛːt, kɛbol]।

11—1523B T.

f = দন্তৌষ্ঠ্য অঘোষ, উষ্ম ধ্বনি, ইংরেজী f,

g = গ, gɦ = ঘ; g' = পূর্ব-বঙ্গের « ঘ »;

ɡ = ফারসী غ অক্ষরের ধ্বনি, ঘোষবৎ উষ্ম « ঘ. »।

h = অঘোষ « হ », ইংরেজীর h = সংস্কৃতের বিসর্গ; যথা, ইংরেজী happy = [hæpi], hat = [hæt];

ɦ = সংস্কৃত ও বাঙ্গালার ঘোষবৎ « হ », যথা, বাঙ্গালা « হাত » = [ɦa:t], « হাট » = [ɦa:ṭ]।

i = ই, ঈ; j = « য », ইংরেজীর y.

ɟ = প্রাচীন সংস্কৃতের শুদ্ধ তালব্য স্পর্শ-ধ্বনি, বৈদিক « জ », কতকটা গ্যা = gy-র মত ধ্বনি।

ʤ = পশ্চিম-বাঙ্গালার « জ »-এর ধ্বনি; ঘৃষ্ট তালব্য ঘোষ ধ্বনি, ʤɦ = পশ্চিম-বঙ্গের « ঝ »।

k = ক; kh = খ, k' = ই-কারের প্রভাবে উচ্চারিত পূর্ব-বঙ্গের « ক »,

l = ল; m = ম; n = ন; o = ও; ɔ = ও-ঘেঁষা অ

p = প, ph = « ফ = পহ্ », হিন্দীর মত, p' = ই-কারের প্রভাবে উচ্চারিত পূর্ব-বঙ্গের « প »।

r = বাঙ্গালার « র »; ɹ = দক্ষিণ ইংরেজী চলিত ভাষার r।

s = সংস্কৃতের দন্ত্য « স », পূর্ব-বঙ্গের « ছ », ফারসীর س ث ص।

ʃ = বাঙ্গালার « শ, ষ, স », ʂ = সংস্কৃতের মূর্ধন্য « ষ »।

t = ত; th = থ; ṭ = ট, ṭh = ঠ; t = ইংরেজী t, দন্তমূলীয়; t', ṭ' = ই-কারের প্রভাবে উচ্চারিত পূর্ব-বঙ্গের « ত » ও « ট »।

u = উ, ঊ; v = দন্তৌষ্ঠ্য ঘোষবৎ উষ্ম ধ্বনি, ইংরেজীর v;

w = ইংরেজীর w, 'উঅ্'।

x = ফারসী خ র ধ্বনি, অঘোষ উষ্ম « খ. »।

z = বাঙ্গালা « মেজদা » [mezda] শব্দে শ্রুত ধ্বনি, ইংরেজীর z, ফারসীর ز ذ ض ظ;

ẓ বা ẓ = তামিল ভাষায় প্রাপ্ত ধ্বনি—মূর্ধন্য ʃ (ষ)-এর ঘোষবৎ রূপ।

ʔ = কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি (glottal stop).

ɸ = প্রচলিত বাঙ্গালা « ফ »-এর ধ্বনি, ওষ্ঠ্য অঘোষ উষ্ম।

β = প্রচলিত বাঙ্গালা « ভ »-এর ধ্বনি; ওষ্ঠ্য ঘোষবৎ উষ্ম।

ʒ = ফরাসী j-র ধ্বনি, ঘোষবৎ তালব্য উষ্ম (ইংরেজী pleasure শব্দে শ্রুত zh-বৎ s-এর ধ্বনি = plezhăr = [pleʒə(r)]).

ɔ = বাঙ্গালা অ-কার; তুলনীয়, ইংরেজী call, law [kʰɔːl, lɔː].

ʌ = সংস্কৃতের 'সংবৃত' অ-কার, হিন্দীর অ-কার, ইংরেজী cut, son শব্দের স্বরধ্বনি = [kʰʌt, sʌn].

ə = হিন্দীর অতি-হ্রস্ব অ-কার; যথা—« রতন » [rʌtən], ইংরেজীর ago, China, Russia, India প্রভৃতির a (= [əgou, tʃainə, rʌʃə, indiə]).

§ ১ ভারতীয় বর্ণমালায়, বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে « খ, ঘ; ছ, ঝ; ঠ, ঢ, থ, ধ; ফ, ভ » এইগুলি মহাপ্রাণ বর্ণ। প্রাতিশাখ্যকারগণ এগুলির উচ্চারণের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক ভারতে এগুলির উচ্চারণ লুপ্ত হয় নাই। অল্পপ্রাণ স্পর্শ বর্ণের (অর্থাৎ বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের) উচ্চারণ-কালে, শ্রূয়মাণ উষ্মা বা প্রাণ বা শ্বাসবায়ুর যুগপৎ নির্গমন ঘটিলে, সোষ্ম বা মহাপ্রাণস্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনির উদ্ভব হয়। ক্-এর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বা শ্বাসবায়ু বা উষ্মা নির্গত হইলে, দাঁড়াইল « ক্ + প্রাণ = খ্ », তদ্রূপ « গ্ + প্রাণ = ঘ্ »

এই প্রাণ বা উষ্মা বা শ্বাসবায়ু যখন সহজ ও স্বাধীন ভাবে নির্গত হয়—কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরস্থ glottal passage বা কণ্ঠনালীমুখের মধ্য দিয়া চালিত হইয়া, উন্মুক্ত মুখ-বিবরে কোথাও ব্যাহত বা বাধা-প্রাপ্ত না হইয়া বাহির হইয়া যায়,—তখন ইহা আমাদের কর্ণে হ-কার এবং বিসর্গের ধ্বনিরূপে প্রতিভাত হয়: কণ্ঠনালীর মধ্যস্থিত vocal chords বা অধরোষ্ঠ-স্বরূপ পেশীর আকর্ষণের ফলে, glottal passage বা কণ্ঠনালী-মুখের সংবার বা রোধ ঘটিলে, নির্গমনশীল

শ্বাসবায়ুর দ্বারা আহত হইয়া উক্ত vocal chords বা কণ্ঠনালীস্থ পেশীগুলির মধ্যে vibration বা কম্পন হয়, এবং তাহার ফলে, ঘোষধ্বনি হ কারের উৎপত্তি ঘটে, এবং কণ্ঠনালীর মধ্যস্থিত glottal passage বা মুখপ্রণালীর বিবার বা মুক্তি ঘটিলে, vocal chords-এর পেশীগুলির আকর্ষণের কারণ থাকে না, নির্গমনশীল শ্বাসবায়ু নিরুপদ্রবে বাহিরে চলিয়া আইসে, কোনও ঝঙ্কৃতি শ্রুত হয় না,—তাহার ফলে অঘোষ হ কারের উৎপত্তি ঘটে।

এই অঘোষ হ-কারই হইতেছে স্বাধীন বিসর্গের মূলধ্বনি, যেখানে এই বিসর্গকে পূর্বগামী স্বরধ্বনির আশ্রয়স্থানভাগিত্ব বা অধীনতা স্বীকার করিতে হয় না। ইংরেজীর h হইতেছে এইরূপ অঘোষ হ কার; আমাদের ভারতীয় ঘোষবৎ হ কার হইতে ইহা পৃথক্। শুদ্ধ প্রাণ বা উষ্মা বা শ্বাসবায়ু, যদি অঘোষ বিসর্গ ও ঘোষ হ কার রূপে বহির্গত হইতে না পারে—মুখের মধ্যে জিহ্বার অথবা মুখের বাহিরে ওষ্ঠদ্বয়ের সমাবেশের ফলে, ইহার নির্গমন যদি ব্যাহত হইয়া যায়, তাহা হইলে যে ধ্বনি শোনা যায়, সেই ধ্বনি হইতেছে জিহ্বাদির সমাবেশ-অনুসারে বিভিন্ন বর্গের spirant বা fricative অর্থাৎ উষ্মধ্বনি সহজ ভাবে বিনির্গত হ কার,—অর্থাৎ অঘোষ [h] এবং ঘোষবৎ [ɦ]-এর পরিবর্তে, আমরা তখন পাই—[x, ɣ, ʃ, ʒ, ʃ, ʒ বা ɬ, s, z, θ, ð; f, v, ɸ, β] প্রভৃতি বিভিন্ন উচ্চারণ-স্থানে উচ্চারিত ভিন্ন ভিন্ন উষ্ম ধ্বনি। পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির (এবং কচিৎ পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির) উচ্চারণের প্রভাবে পড়িয়া, অর্থাৎ এইরূপ স্বরধ্বনির (অথবা ব্যঞ্জনধ্বনির) উচ্চারণে জিহ্বার অবশ্যম্ভাবী সমাবেশের প্রভাবে পড়িয়া, এইরূপ শুদ্ধ বিসর্গ বা হ-কার, জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয় প্রভৃতি উষ্ম ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়া যায়, যেমন [ah, aɦ > ax, aɣ, ih, iɦ > iç, iʝ, বা iʃ, iʒ; uh, uɦ > uɸ, uβ], ইত্যাদি। কণ্ঠ্য, ওষ্ঠ্য এবং তালব্য প্রভৃতি এই সকল বিশিষ্ট উষ্ম ধ্বনি হইতেছে বিশুদ্ধ কণ্ঠনালীজাত উষ্মধ্বনি বা প্রাণধ্বনি অঘোষ «ঃ» [h] ও ঘোষবৎ «হ» [ɦ]-এর রূপভেদ।

স্পর্শবর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত করিতে যে প্রাণ বা উষ্মার বা শ্বাসবায়ুর

আবশ্যকতা হইয়া থাকে, তাহা কেবল মাত্র সহজ «অঘোষ হ»—«ঃ» (অঘোষ «ক্ চ্ ট্ ত্ প্»-এর সহিত), অথবা সহজ «ঘোষবৎ হ» (ঘোষবৎ «গ্ জ্ ড্ দ্ ব্»-এর সহিত)। অতএব,—

অল্পপ্রাণ অঘোষ «ক্ চ্ ট্ ত্ প্» [k c ṭ t p] এর সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীয় «অঘোষ প্রাণ বা উষ্মা [h]» যোগ করিয়া, অঘোষ মহাপ্রাণ «খ্ ছ্ ঠ্ থ্ ফ্» [kh ch ṭh th ph]-এর উৎপত্তি হয়, এবং তদ্রূপ অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ «গ্ জ্ ড্ দ্ ব্» [g j ḍ d b] এর সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনালীয় «ঘোষবৎ প্রাণ বা উষ্মা [ɦ]» যোগ করিয়া ঘোষবৎ মহাপ্রাণ «ঘ্ ঝ্ ঢ্ ধ্ ভ্» [gɦ jɦ ḍɦ dɦ bɦ]-এর উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে।

ভারতীয়-আর্য-ভাষায় আদি যুগ হইতে এই মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি বিদ্যমান; এগুলি মূল আর্য-ভাষার বিশিষ্ট ধ্বনি। সেই হেতু, আর্য ভাষার জন্য প্রাচীন কালে ভারতে প্রথম যখন বর্ণমালার উদ্ভব হইল, তখন পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর দ্বারা এই বিশিষ্ট ধ্বনিগুলি দ্যোতিত হইল। তাহার ফলেই আমরা প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মী বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন নাগরী, বাঙ্গালা, শারদা, তেলুগু কন্নড়, গ্রন্থ প্রভৃতি আধুনিক বর্ণমালাগুলিতে «খ, ঘ, ছ, ঝ» প্রভৃতি পৃথক্ দশটী মহাপ্রাণ বর্ণ পাই। পরবর্তী কালে যখন মুসলমানদের আমলে ফারসী লিপির সাহায্যে ভারতীয় ভাষা হিন্দুস্থানী প্রভৃতি প্রথম লিখিত হইল, তখন মহাপ্রাণ বর্ণগুলির প্রকৃতি সহজেই বিশ্লেষ করিয়া লইয়া, অল্পপ্রাণ ধ্বনিবাচক «ক, গ, চ, জ, ত, দ» প্রভৃতিতে হ কার যোগ করিয়া লেখা হইল—کھ چھ جھ تھ «কহ (খ), চহ (ছ), জহ (ঝ), ত্হ (থ), দহ (ধ)» ইত্যাদি। প্রাচীন লাতীনেরা যে রীতিতে গ্রীকের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিকে রোমান বর্ণমালায় লিখিত (প্রাচীন গ্রীক χ = খ, φ = ফ, θ = থ, রোমানে যথাক্রমে ch, ph, th), সেই রীতির অনুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় রোমান অক্ষরে, আমাদের মহাপ্রাণ «খ, ঘ, ছ, ঝ, থ, ধ» প্রভৃতির স্থানে ইংরেজেরা kh, gh, ch (chh), jh, th, dh প্রভৃতি লেখার ব্যবস্থা করিয়া লইল।

§ ২। মহাপ্রাণ ধ্বনির যথাযথ উচ্চারণ করিতে হইলে, অল্পপ্রাণ স্পর্শ

ধ্বনির অনুগামী এই কণ্ঠনালীয় উষ্ম ধ্বনিরও স্পষ্ট এবং শ্রুতিগম্য উচ্চারণ করা আবশ্যক। হ-কারের উচ্চারণ ভাষায় বিশুদ্ধ ভাবে বিদ্যমান না থাকিলে, এইরূপ মহাপ্রাণ স্পর্শ-বর্ণগুলির উচ্চারণ করা যে কঠিন হইয়া উঠে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক ভারতে বহু শতাব্দী ধরিয়া মৌখিক ভাষার বিকারের বা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সংস্কৃত বা ভারতের আদি-আর্য-ভাষার প্রাচীন উচ্চারণ-রীতি সর্বত্র সংরক্ষিত হইতে পারে নাই। 'সংস্কৃত', উচ্চারণ-পরিবর্তন বা উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে, 'প্রাকৃত' হইয়া দাঁড়াইল। উচ্চারণের এই ধারায়, যা বিকার অথবা পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, এক স্বাভাবিক বিকাশ-ধর্মের ফলে; কারণ, প্রতি পুরুষে বা বংশ-পর্যায়ে, ভাষা অলক্ষিত ভাবে একটু একটু করিয়া বদলায়। অনেক সময়ে এই বদলানো এত সূক্ষ্ম ভাবে ঘটে যে, দুই তিন পুরুষের সাধারণ লোকে তাহা ধরিতে পারে না। অপর, উচ্চারণের ধারায় ঘটিয়াছিল, নানা অনার্য ভাষী জাতি কর্তৃক আর্য-ভাষা গ্রহণের ফলে, আর্য ভাষার ধ্বনি-রীতি অনার্যদের অভ্যস্ত ছিল না, আর্য-ভাষা অনার্য-ভাষীর দ্বারা গৃহীত হইতে থাকিলে, অনার্য ভাষার বহু ধ্বনি, বহু উচ্চারণ-রীতি এই আর্য-ভাষায় আসিয়া যায়। ভারতবর্ষে যে লক্ষ লক্ষ অনার্য ভাষী আর্য-ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল, সেরূপ অনুমান করিবার পক্ষে অনেক কারণ আছে। এইরূপে প্রাকৃত যুগেই সংস্কৃত ভাষার ভাঙন ধরিয়াছিল—বাহ্যতঃ উচ্চারণে, এবং আভ্যন্তরীণ ভাবে শব্দে, ব্যাকরণে, ও বাক্য-রীতিতে। পরে আরও ধরে। আদি-আর্য-ভাষার তথা প্রাকৃত যুগের উচ্চারণ-রীতি কিরূপ ছিল, তাহা সর্বত্র স্পষ্ট ভাবে বুঝিবার উপায় নাই। কিন্তু আধুনিক আর্য ভাষাগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায়, আদি-আর্য উচ্চারণ রীতি বহুস্থলে অনপেক্ষিত ভাবে পরিত্যক্ত বা পরিবর্তিত হইয়াছে। এইরূপ পরিত্যাগ বা পরিবর্তন যে কত প্রাচীন কালে ঘটিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্ণয় করা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য।

§ ৩। বাঙ্গালা ভাষায় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির (এবং হ-কারের) অবস্থান আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এগুলির যথাযথ উচ্চারণ-বিষয়ে সমগ্র

গৌড়-বঙ্গদেশ (অর্থাৎ রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট, চট্টল) এক নহে। এই বর্ণগুলির দুই প্রকারের উচ্চারণের অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। এক প্রকারের উচ্চারণ পশ্চিম-বঙ্গে ('গৌড়দেশে') শোনা যায় ; অন্য প্রকারের উচ্চারণ পূর্ব-বঙ্গে ('বঙ্গদেশে') মিলে। উত্তর-বঙ্গে (বরেন্দ্র-ভূমিতে ও কামরূপে) পূর্ব-বঙ্গের প্রভাব আজকাল সমধিক ভাবে বিদ্যমান, কিন্তু উচ্চারণ-বিষয়ে এক সময়ে উত্তর-বঙ্গ রাঢ়ের সহিত সমান ছিল বলিয়া অনুমান হয়। আমরা 'গৌড়' ও 'বঙ্গ'—এই দুই প্রদেশের বিশিষ্ট উচ্চারণ আলোচনা করিব

§ ৪ গৌড়ের মহাপ্রাণ বর্ণগুলির উচ্চারণ-সম্বন্ধে বিশেষ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছু বলিব না, অন্যত্র এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। গৌড়ে হ-কারের উচ্চারণ বলবৎ আছে—শব্দের আদিতে, ঘোষবৎ « হ »-কে আমরা যথাযথ উচ্চারণ করিয়া থাকি, যেমন—« হয়, হাত, হিত, হে, হোম, হুকুম, হিন্দু (হিঁদু) » [ɦɔ̃ĕ, ɦaːt, ɦiːt, ɦeː, ɦoːm, ɦukum, ɦindu বা ɦĩdu]। শব্দের মধ্যে ঘোষবৎ « হ » দুর্বল হইয়া পড়ে, এবং সাধারণতঃ কথিত ভাষায় লুপ্ত হয় : যথা, « ফলাহার > ফলাআর > ফলার [pholaɦar > pholaar > pholar, ɸolar] ; পুরোহিত > পুরোইত্ > *পুরুইত্ > পুরুত্ [puroɦit > puroit > puruit > purut], বাহাত্তর > বাআত্তর [baɦattor > baattor] ; পহুঁছা > পহুঁছা > পউঁছা, পৌঁছা [pɔɦũcʃha > pɔ̃hucʃha > pɔ̃ucʃha] ; বহূ > বহু > বউ, বৌ [bɔɦuː > boɦu > bou], মহু > মৌ [moɦu > mou] ; সহি > সই, সৈ [ʃoɦi > ʃoi], দহি > দই, দৈ [doɦi > doi] »। শব্দের অন্তে ঘোষবৎ « হ » [ɦ] গৌড়ে পাওয়া যায় না—লুপ্ত হয় ; অথবা শেষে স্বরবর্ণ আনা হয়, এবং এই স্বরবর্ণের আশ্রয় পাইয়া « হ » পূর্ণ-ভাবে অবস্থান করে ; যেমন—« সাধু > সাহু > সাহ > সাহ্ > সা বা সাহা [saːdhu > ʃaːɦu > ʃaːɦo > ʃaːɦ > ʃaː, ʃaɦa] ; ফারসী শাহ্ > শা, শাহা [ʃaːh > ʃaː, ʃaɦa] ; অষ্টাদশ > অট্ঠারহ—হিন্দী অঠারহ্ [aʈhaːrah], বাঙ্গালা আঠারো [aʈharo] » ; ইত্যাদি। অঘোষ « হ » [h]—অর্থাৎ বিসর্গ—গৌড়ের ভাষায় হর্ষ-বিস্ময়াদি-বাচক

অব্যয় শব্দে, কেবল শব্দের অন্তে, শোনা যায়, যেমন—« আঃ, এঃ, ইঃ, ওঃ, উঃ [ah, eh, ih, oh, uh] » ইত্যাদি; আবার এই ধ্বনি, আশ্রিত স্বরধ্বনির প্রকৃতি-অনুসারে, বিকল্পে বিভিন্ন উষ্ম ধ্বনিতেও পরিবর্তিত হইতে পারে; « আখ্, এশ্, ইশ্, ওফ্, উফ্ [ax, eç, iç বা iʃ, oɸ, uɸ] » ইত্যাদি।

স্পর্শ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির মধ্যে, « ফ ভ » সাধারণতঃ এখন উষ্ম ধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, « ফল » = [phɔːl] না হইয়া [ɸɔːl], বা [fɔːl], « প্রফুল্ল » [prophullo] স্থানে [proɸullo, profullo]; « ভয় » = [bhɔe̯] স্থলে [βɔe̯], « উভয় » = [ubhɔe̯] স্থলে [uβɔe̯] বা [uvɔe̯]; « অভিভাবক » = [obhibhabok] স্থলে [oβiβabok, ovivabok], « লাভ » = [laːbh] না হইয়া [laːβ, laːv]। « ফ ভ » ভিন্ন অন্য মহাপ্রাণ বর্ণ (খ ঘ, ছ ঝ, ঠ ঢ, থ ধ) পশ্চিম-বঙ্গের উচ্চারণে শব্দের আদিতে অবিকৃত থাকে, এইরূপ অবস্থায় এগুলি স্পষ্ট উচ্চারিত হইয়া থাকে—মহাপ্রাণের বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ অল্পপ্রাণ স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে অঘোষ বা ঘোষবৎ হ-কারের উচ্চারণ) এখানে পুরাপুরি বিদ্যমান আছে; যেমন—« খায় [khae̯], ক্ষতি [khoti] (অথবা 'খেতি' [kheti]), খা [kha], ঘা [ɡɦa], ঘুম [ɡɦuːm], ঘ্রাণ [ɡɦraːn], ছয় [tʃhɔe̯], ছানা [tʃhana], ঝাউ [dʒɦau], ঝড় [dʒɦɔɽ], ঝাঁক [dʒɦãk], ঠাকুর [ʈhakur], ঠিকা [ʈhika], ঢাক [ɖɦak], ঢোল [ɖɦoːl], থালা [thala], থলে [thole], ধান [dɦaːn], ধর্ম [dɦɔrmo], ধ্রুব [dɦrubo] » ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের অন্তে এই মহাপ্রাণগুলি আসিলে, বা শব্দের মধ্যে অন্য ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বে আসিলে, ইহাদের প্রাণ অস্পষ্ট, অর্থাৎ আনুষঙ্গিক হ-কার (অঘোষ বা ঘোষবৎ), আর উচ্চারিত হয় না,—কেবল অল্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনিই শোনা যায়; এক কথায়, এই অবস্থায় উচ্চারণে ইহারা অল্পপ্রাণ বর্ণেই পরিবর্তিত হয়; যথা—« মুখ = মুক [muːkh > muːk], রাখ = রাক্ [raːkh > raːk], রাখিতে > রাখ্‌তে = রাক্‌তে [rakhite > rakhte > rakte], দেখিতে > দেখ্‌তে = দেক্‌তে [dekhite > dekhte > dekte], বাঘ = বাগ [baːɡɦ > baːɡ], বাঘকে > বাগ্‌কে = বাক্‌কে [baɡɦke > baɡke > bakke], মাছ = মাচ্ [maːtʃh >

অল্পপ্রাণে আনয়নই সাধারণ, তবে ক্বচিৎ বিকল্পে অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হইতে পারে। সাধুভাষার পাঠে, বা সজ্ঞান ও সচেষ্ট সাধুভাষানুমোদিত উচ্চারণে অবশ্য «হ» [ɦ] বা ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারিত হইতে পারে।

২। অঘোষ «হ» [h]—বিসর্গ—শব্দের অন্তে শোনা যায়, এবং এই অঘোষ হ-ই অঘোষ মহাপ্রাণের—«খ ছ ঠ থ ফ»-এর অঙ্গীভূত হইয়া বিদ্যমান [k-h, ʧ-h, ʈ-h, t-h, p-h]।

এতদ্ভিন্ন «ন(ণ), ম, র, ল»—উচ্চারণে ইহাদের পরে হ-কার আসিলে, এই হ-কারকে সাধারণতঃ বর্জন করা হয়—যেখানে স্পষ্ট উচ্চারণ করা হয়, সে অবস্থা ছাড়া: যথা—«চিহ্ন = চিন্নো [ciɦnʌ > ʧinɦo > ʧinno], মধ্যাহ্ন = মোদ্দ্যান্নো [mʌdɦja-ɦnʌ > modɦja:nɦo > moidɦeanɦo > modoɦenno], অপরাহ্ণ = অপোরান্নো [ʌpʌra:ɦnʌ > oporanɦo > oporanno], ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্ মণ > ব্রাম্হণ্ = ব্রাম্মোন [braɦmʌnʌ > bramɦono > brammon], ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্ ম, > ব্রাম্হ = ব্রাম্মো [braɦmo > bramɦo > brammo], পূর্ব-বঙ্গে «ব্রাম্মা» = [bra mmo], গর্হিত = গোর্হিৎ, গোর্রিৎ [gorɦit > gorrit], আহ্লাদ = আহ্লাদ > আলহাদ = আল্লাদ্ [a:ɦla:dʌ > alɦad > allad], প্রহ্লাদ = প্রহ্লাদ > প্রল্হাদ > প্রোল্লাদ, প্রেল্হাদ > প্রেল্লাদ্ > পেল্লাদ্ [prʌɦla:dʌ > prolɦad > prolɦad, prelɦad > prollad, prelɦad, pellad]», ইত্যাদি

গৌড়ের ভাষাকে পশ্চিমের হিন্দীর সহিত তুলিত করিলে দেখা যায় যে, হিন্দী এ বিষয়ে গৌড়ের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর রক্ষণশীল। হিন্দীতে সব ক্ষেত্রেই—কি আদিতে, কি মধ্যে, কি অন্তে—হ-কার [ɦ] এবং মহাপ্রাণ ধ্বনি অটুট থাকে, যথা—বাঙ্গালা «বোনাই» [bonaɪ], হিন্দী «বহনোঈ» [bəɦnoːɪ]; বাঙ্গালা «বউ, বৌ» [bou], হিন্দী «বহূ» [bʌɦuː], বাঙ্গালা «তের» [tæro], হিন্দী «তেরহ্» [teːrʌɦ, te rʌɦə].

§ ৫। এক্ষণে বঙ্গের (অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গের) মৌখিক বা কথ্য ভাষায় এই

ধ্বনিগুলির যে উচ্চারণ শোনা যায়, তাহার আলোচনা করা যাউক। পশ্চিম-বঙ্গের সাধারণ অধিবাসীর ধারণা এই যে, পূর্ববঙ্গ-বাসিগণ ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারে না, এবং ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণগুলিকে অল্পপ্রাণ করিয়াই উচ্চারণ করে—"ঘ ঝ ঢ ধ ভ"-কে অবিমিশ্র "গ জ ড দ ব" বলিয়া থাকে, চ বর্গীয় বর্ণগুলির তালব্য উচ্চারণ—অর্থাৎ [tʃ, tʃh, dʒ, dʒɦ]—স্থলে দন্ত্য উচ্চারণ—[ts, s, dz বা z]; এবং "ড়, ঢ়" [ɽ, ɽɦ] স্থলে "র" [r], এইগুলির, ও ঘোষ মহাপ্রাণের অল্পপ্রাণ উচ্চারণ; তথা হ-কারের লোপ; এই সমস্ত পূর্ব-বঙ্গের ভাষার বা উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

কিন্তু এই মহাপ্রাণগুলিকে যে কেবল মাত্র অল্পপ্রাণ করিয়া লওয়া হয় না, এবং হ-কারের লোপ-সাধন মাত্র হয় না, ইহা প্রত্যেক পূর্ববঙ্গ-বাসী জানেন। আসল কথা এই যে—কণ্ঠনালীতে জাত উষ্ম ধ্বনি হ-কারের পরিবর্তে অন্য একটী ধ্বনি পূর্ব-বঙ্গে ব্যবহৃত হয়, এবং মহাপ্রাণ বর্ণে অবস্থিত অঘোষ বা ঘোষ উষ্মা বা প্রাণ অথবা শ্বাসবায়ু, অর্থাৎ কিনা হ কারের স্থানে, এই নবীন ধ্বনিটী উচ্চারিত হয়; অথবা এই ধ্বনির উচ্চারণের উপযোগী কার্য মুখের মধ্যে ঘটে। এই ধ্বনিটী হইতেছে, কণ্ঠনালীর মুখে অবস্থিত মুখদ্বার-স্বরূপ পেশীগুলির স্পর্শ ও ঝটিতি বিচ্ছেদের ফলে জাত এক প্রকার স্পর্শ-ধ্বনি—glottal stop বা 'কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনি'।

কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়া নিঃশ্বাসবায়ু যখন বহির্গত হয় তখন তাহা কোথাও বাধা প্রাপ্ত না হইলে, স্বরধ্বনির উৎপত্তি হয়। মুখ মধ্যে নির্গমন-পথ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলে, মুখ-বিবরে সঙ্কোচ-স্থানের অবস্থান অনুসারে বিভিন্ন উষ্ম ধ্বনির উদ্ভব হয়। মুখ-বিবরের অভ্যন্তর-স্থিত বায়ু-নির্গমন-পথকে জিহ্বার দ্বারা পূর্ণ ভাবে বা আংশিক ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া দিতে পারা যায়। আংশিক ভাবে অবরুদ্ধ অবস্থায় বায়ু যখন জিহ্বার দুই পার্শ্বস্থিত উন্মুক্ত স্থান দিয়া নির্গত হয়, তখন ল-কারের ধ্বনির উদ্ভব হয়। জিহ্বাকে মুখের ঊর্ধ্বভাগে স্পর্শ করাইয়া মুখপথকে সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করা যায়; এবং অধর ও ওষ্ঠ উভয়কে মিলিত করণানন্তর মুখ বন্ধ করিয়াও এই মুখপথ অবরুদ্ধ করা যায়। নির্গমনশীল

বায়ু রোধস্থানে আসিয়া জমে, এবং জিহ্বাকে ঝটিতি নামাইয়া লইলে বা অধরোষ্ঠকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, রুদ্ধ বায়ু হঠাৎ দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া সবেগে বহির্গত হইবার চেষ্টা করে, তখন একটা explosion বা ফট্-কার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। ফলে, সঙ্গে সঙ্গে « ক্ গ্, চ্ জ্, ট্ ড্, ত্ দ্, প্ ব্ » প্রভৃতি তদনুযায়ী 'স্পর্শ ধ্বনি' জাত হয়। কিন্তু মুখপথ রুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে নাসাপথ উন্মুক্ত থাকিলে, রোধের অবস্থান-অনুসারে নাসিক্য-ধ্বনি « ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্ » [ŋ ɲ ɳ n m] এর উৎপত্তি হয়।

স্পর্শ ধ্বনির উদ্ভবে জিহ্বা এবং অন্য বাগ্‌যন্ত্রের পূর্ণ স্পর্শ, এবং মুখপথের রোধ আবশ্যক। মুখ-বিবরে জিহ্বা-দ্বারা, বা মুখদ্বারে অধরোষ্ঠের সহায়তায় যেরূপ রোধ হয়, তদ্রূপ রোধ কণ্ঠনালীর ভিতরেও হইয়া থাকে, এবং এই রোধ বা স্পর্শের ফলে, সেখানে যে স্পর্শ-ধ্বনির উদ্ভব হয়, তাহা বহু ভাষায়, « ক, গ, ত, দ, প, ব » -এর মত একটী বিশিষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। চলিত বাঙ্গালায়—গৌড়ের ভাষাতেও—ইহা দুর্লভ নহে। কাশিবার সময়ে, যখন কণ্ঠনালীপথের পেশী দ্বারা নালীপথের দ্রুত রোধ ও উন্মোচন ঘটে, তখন আমরা সকলেই এই কণ্ঠনালী-জাত স্পর্শ ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া থাকি। এই ধ্বনির জন্য ইউরোপীয় ধ্বনিতত্ত্ববিদ্‌গণ ['] বা [ʔ] এইরূপ একটি অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা বাঙ্গালায় ['] (উদ্ধার-চিহ্ন) অথবা [⁀] (ইলেক-চিহ্ন) ব্যবহার করিতে পারি। এই ধ্বনির জন্য অক্ষরটী থাকিলে, সাধারণ কাশির ধ্বনি যাহা আমরা কানে শুনি, তাহাকে বানান করিয়া লেখা যায়—[ʔəhə ʔəhə] = « 'আহা 'আহা »। এই ধ্বনি আরবীতে 'হাম্‌জা' বা 'আলিফ হাম্‌জা' নামে একটি বিশিষ্ট ব্যঞ্জন-ধ্বনি [ء] বলিয়া স্বীকৃত, যেমন—رأس, سائل, تأمل, قرآن, مأت, ماء ra's, sâ'il, ta'ammul, qur'an, ma'ata, mâ' ইত্যাদি। জর্মান ভাষায় শব্দের আদিতে এই ধ্বনি খুবই পাওয়া যায়—জর্মানে যেখানে কোনও শব্দের প্রারম্ভে অন্য কোনও ব্যঞ্জন-ধ্বনি থাকে না, তখন সেখানে এই কণ্ঠনালীয় স্পর্শ ধ্বনি আসে। জর্মান ভাষায় স্বরাদি শব্দ নাই। যেমন—auch, Abend,

echt, Ihre, Ehe, und, Uhr, Onkel, Ort, Oesterreich—[ʔaux, ʔabən, ʔeçt, ʔiːrə, ʔeːhə, ʔʊnt, ʔuːr, ʔɔŋkl, ʔɔrt, ʔøːstərraiç] ইত্যাদি।

পূর্ব-বঙ্গে হ-কারের বদলে যে এই ধ্বনিই ব্যবহৃত হয়, হ-কারের লোপ হয় না, ইহা একটু কান পাতিয়া শুনিলেই গৌড়িয়া লোকেও বুঝিতে পারিবে। যথা—“হাইল > 'আইল্ [ɦail > ʔail], হয় > 'অয় [ɦɔe̯ > ʔɔe̯], হাত > 'আত [ɦaːt > ʔaːt]; হাতী > 'আতী, 'আত্তী [ɦati > ʔati, ʔatti]; হাতিয়া > 'আইত্যা [ɦatia > ʔaitːæ], হিন্দু > 'ইন্দু [ɦindu > ʔindu], হুকা, হুক্কা > 'উকা, 'উক্কা [ɦuka, ɦukka > ʔuka, ʔukka]; হানি > 'আনি [ɦani > ʔani]”; ইত্যাদি।

§ ৯। মহাপ্রাণ স্পর্শ-বর্ণগুলির উচ্চারণ লইয়া পূর্ব বঙ্গে সর্বত্র ঐক্য নাই, তবে সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, মহাপ্রাণ বর্ণ ঘোষবৎ হইলে, ইহার সঙ্গেকার হ-অংশকে কণ্ঠনালীয় স্পর্শে পরিবর্তিত করা বঙ্গের (অর্থাৎ পূর্ব বঙ্গের) প্রাচীন কথ্য ভাষার রীতি ছিল, এবং এই রীতি এখনও সর্বত্র প্রচলিত আছে। যথা—“ঘা” অর্থাৎ “গ্হা” স্থলে “গ্'া” [gɦa > gʔa], “ঢাক” অর্থাৎ “ড্হাক” স্থলে “ড্'াক” [ɖɦak > ɖʔak]; “ধান” অর্থাৎ “দ্হান” স্থলে “দ্'ান” [dɦan > dʔan], “ভাত” অর্থাৎ “ব্হাত্” স্থলে “ব্'াত্” [bɦat > bʔat]; “মধ্য” অর্থাৎ “মদ্ধ্য = মদ্ধিয় = মদ্-দ্হিয়” স্থলে “মইদ্-দ্'ইয়”, তাহা হইতে “মইদ্-দ্'ইঅ, ম্'অইদ্দ” [mɔdɦjɔ > mɔiddɦjɔ > mɔiddʔjɔ, mʔɔiddɔ], “আঘাত” অর্থাৎ “আগ্হাৎ” স্থলে “আগ্'াৎ, 'আগাৎ” [agɦat > agʔat, ʔagat]; ইত্যাদি।

কিন্তু অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনি শব্দের আদিতে থাকিলে, মহাপ্রাণরূপেই উচ্চারিত হইত; যথা—“খাওয়া [kʰaoa]; ঠাকুর [ʈʰakur]; থোয় [tʰoe̯]; ফল [pʰɔl]”। শব্দের মধ্যে অবস্থানে “খ, ঠ, থ, ফ” কোনও স্থলে মহাপ্রাণ-রূপেই রক্ষিত হইয়া আছে,—যেমন “পাখা, আঠা, কথা” [pakʰa, aʈʰa, kɔtʰa], কিন্তু কোনও কোনও স্থলে, এইরূপ শব্দের

dʒit'i > ts'idi]; কাঁঠাল=কাট্‌হাল=কাট্'আল=ক্'আডাল kãṭhal > kaṭ'al > k'aḍal]; পাঁঠা=পাট্‌হা=পাট্'আ=প্'আডা, ফ্'আডা [pãṭha > paṭ'a > p'aḍa, ɸ'aḍa]; উঠন=উট্‌হন=উট্'অন='উডন [uṭhon > uṭ'on > 'uḍon]; লাঠি=লাট্‌হি=লাট্'ই=ল্'াডি [laṭhi > laṭ'i > l'aḍi]; তখ্‌তা=তক্‌হ্‌তা=তক্'তা=ত্'অক্তা [tokhta > tok'ta > t'okta] *; ইত্যাদি।

তদ্রূপ,—* অন্ধ > অন্‌দ্‌হ > অন্‌দ্'অ > 'অন্‌দ্অ, 'অন্ধ [ondɦo > ond'o > 'ondo]; অধ্যক্ষ > অইদ্‌-দ্'অক্খ='অইদ্দক্ক [odɦjokkho > oidd'okk'o > 'oiddokko]; আভ=আব্‌হ্‌=আব্'='আব্ [a:bɦ > a:b' > 'a:b]; আধা=আদ্‌হা=আদ্'আ='আদা [adɦa > ad'a > 'ada]; কাঁধ=কান্‌দ্'=ক্'ান্‌দ্ [kã:dɦ=ka:ⁿd' > k'a:ⁿd]; বাঘ=বাগ্‌হ্=বাগ্'=ব্'াগ [ba:gɦ > ba:g' > b'a:g]; তদ্রূপ, ভাগ=ব্'াগ [bɦa:g > b'a:g]; গাধা=গাদ্‌হা=গাদ্'া=গ্'াদা [gadɦa > gad'a > g'ada]; বুদ্ধি=ব্‌উদ্দি [buddɦi > b'uddi]; দীঘী > দিগি' > দি'গি [digɦi > dig'i > d'igi]; জিহ্বা=জিব্‌ভা=জি'ব্বা, জে'ব্বা (জ=dz) [dʒibbɦa > dzibb'a > dz'ibba, dz'ebba]; দুধ=দ্'উদ্ [du:dɦ > d'u:d]; মেঘ=ম্'এগ্ [me:gɦ > m'ɛ:g]; লাভ=লাব'=ল্'াব [la:bɦ > la:b' > l'a:b]; সভা=স্'অবা [ʃobɦa > ʃ'oba]; সাঁঝ=স্'ান্‌জ [ʃã:dʒɦ=ʃa:ⁿdz' > ʃ'a:ⁿdz]; দেঢ়=দেড়্'=দ্'এড়্ [de:ṛɦo=de:ṛ' > d'ɛ:ṛ] *। *ডাহিন > ডা'ইন=ড্'াইন [ḍaɦin > ḍa'in > ḍ'ain]; তহবিল=ত'অবিল=ত্'অবিল [toɦobil > to'obil > t'obil]; ডাহুক=ডা'উক > ড্'াউক [ḍaɦuk > ḍa'uk > ḍ'auk]; বহিন=ব'ইন=ব্'অইন, ব্'উইন [boɦin > bo'in > b'oin, b'uin]; বাহির=বা'ইর=ব্'াইর [baɦir > ba'ir > b'air]; শহর=শ'অর=শ্'অঅর, শ'অর [ʃoɦor > ʃo'or > ʃ'oor, ʃ'o:r]; মহল=ম্'অঅল [moɦol > m'ool]; সাহস=শা'অশ্=শ্'াওশ্ [ʃaɦoʃ > ʃa'oʃ > ʃ'aoʃ]; বাহল্য=বা'উইল্ল=ব্'াউইল্ল

[bafiobja > ba'uillo > b'aullo] ; সন্দেহ = স'অন্দেঅ [ʃondeɦo > ʃondeʼo > ʃʼondeo] • ; ইত্যাদি।

হ-কারের বা মহাপ্রাণের উষ্ম অংশের বিকারে জাত কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনিকে শব্দের আদিতে এইরূপে আগাইয়া দেওয়া, পূর্ব-বঙ্গের কথিত ভাষায় একটী আশ্চর্য বা লক্ষণীয় রীতি।

§১০। পূর্ব-বঙ্গের ভাষায়, মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের প্রাণ বা উষ্মার পরিবর্তে কণ্ঠনালীয় স্পর্শ ধ্বনির আগমনের ফলে, সংস্কৃতে অজ্ঞাত, নূতন কতকগুলি কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-মিশ্র, বা কণ্ঠনালীয়-স্পর্শানুগত, অথবা অভ্যন্তর-স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণের উদ্ভব ঘটিয়াছে: যথা—ক' গ', চ' (= ts') জ' (= dz'), ট' ড', ত' দ', ন', প' ব', ম', র', ল', শ' •। এগুলি পূর্ব-বঙ্গের সাধারণ • ক গ, চ (ts) জ (dz) ট ড, ত দ, ন, প ব, ম, র, ল, শ • হইতে পৃথক্ এবং ইহাদের যথাযথ উচ্চারণের উপর পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় শব্দের অর্থ নির্ভর করে।—যথা—

কান্দ্ [ka:nd] = কাঁদ, কিন্তু কাঁধ = ক'ান্দ (ক্'আন্দ্) [k'a:nd] ;
গা [ga:] = দেহ, কিন্তু ঘা = গ'া (গ্'আ) [g'a:] ;
গুরা [gura] = গোরা, কিন্তু ঘোড়া = গু'রা (গ্'উরা) [g'ura] ;
জর [dzo:r] = জ্বর, কিন্তু ঝড় = জ'র (জ্'অর) [dz'o:r] (জ = dz) ;
ডাইন [dain] = ডাকিনী, কিন্তু ডাহিন (= দক্ষিণ) = ডা'ইন (ড্'আইন্)
[d'ain] ;
তারা [tara] = নক্ষত্র, তাহারা (সাধু ভাষায়) = ত'ারা (ত্-'আরা) [t'ara] ;
দান [da:n] = দান, ধান = দ'ান (দ্'আন) [d'a:n] ;
পাকা [paka] = পক্ব, পাখা = প'াকা (প্'আকা) [p'aka] ;
বাত [ba:t] = বাত-ব্যাধি, ভাত = ব'াত (ব্'আত্) [b'a:t] ;
মৈদ্দ [moiddo] = মদ্য, মধ্য = মৈদ্দ' (ম্'অইদ্দ) [m'oiddo] ;
আইল্ [ail] = ক্ষেত্রের আলি, নৌকার হাইল = 'আইল্ ['ail] ; ইত্যাদি।

§ ১১। মহাপ্রাণ বর্ণের বা হ-কারের বিকারে পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় যেখানে

কণ্ঠনালীয়-স্পর্শধ্বনি-মিশ্র ব্যঞ্জন বর্ণ বা কণ্ঠনালীয় স্পর্শ আইসে, সেখানে সংশ্লিষ্ট অক্ষরে স্বরাঘাত ঘটে, এবং স্বরও উদাত্তে উঠে। ইহা একটী বিশেষ নিয়ম। যথা—« তার গায়ৎ (বা ‘ক’ান্দে) ‘গ’া ’ঐছে বলি হেতে কান্দে » [tar gaet (’k’ãde) ’g’a: ’oise boli hete kãde] (=তার গায়ে বা কাঁধে ঘা হ’য়েছে ব’লে সে কাঁদে) ; « পরা » [pora]=পড়া, পতন, কিন্তু « পঢ়া > ‘প’রা » [’p’ora]=পাঠ করা ; ইত্যাদি।

§ ১২। এইরূপ উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালা দেশে—পূর্ব-বঙ্গে—কত দিন হইল আসিয়াছে ? এ বিষয়ে কেহ প্রাচীন উচ্চারণ লক্ষ্য করেন নাই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের, এমন কি শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণ গৌড়িয়া লোকের কাছে তামাশার বিষয় ছিল। কবিকঙ্কণের সময়ে পূর্ব-বঙ্গে শ-স্থলে « হ » বলিত—«শুকুতা=হুকুতা » ; অনুমান হয়, মূল হ-কার কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-বর্ণে পরিণত না হইলে, শ-কার (অর্থাৎ « শ, ষ, স ») নূতন করিয়া হ-কার হইত না ; অন্যথা মূল হ-কার এবং শ-জাত নবীন হ-কার লইয়া ভাষায় ধ্বনি-বিষয়ে অনিশ্চিততা এবং দুর্বোধ্যতা আসিয়া যাইত। হ-কারের কণ্ঠনালীয় স্পর্শে পরিণতি স্বীকার করিলে, মহাপ্রাণগুলির পরিবর্তনও স্বীকার করিতে হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকেও পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় যে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল, এরূপ অনুমান অযৌক্তিক হইবে না।

এই বৈশিষ্ট্য সম্ভবতঃ আরও প্রাচীন, এবং হয় তো পূর্ব-বঙ্গে আর্য-ভাষার প্রচারের সময় হইতেই ভাষায় এইরূপ উচ্চারণ-রীতি প্রবেশ করিয়াছে। ভোটগণ (অর্থাৎ তিব্বতীরা) কাশ্মীর-অঞ্চল হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ-ধর্ম প্রথমে গ্রহণ করে, কিন্তু পরে বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে তিব্বতীদের ঘনিষ্ঠ যোগ হয়—তিব্বতীরা বাঙ্গালা দেশের শিক্ষকদের মানিয়া লয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের একখানি প্রাচীন তিব্বতী পুঁথিতে কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র উদ্ধৃত আছে, তাহাতে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ তিব্বতী অক্ষরে লিখিত আছে ; এই পুঁথিতে যেরূপ বর্ণবিন্যাস আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে « ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ »-এর « গ’, জ’, ড’, দ’, ব’ » উচ্চারণই যেন তখন তিব্বতীরা

শিখিয়াছিল,—পুঁথিখানিতে পরবর্তী কালের মত এই মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিকে তিব্বতী অক্ষরে « গ জ ড দ ব
হ হ হ হ হ » রূপে লিখিবার প্রয়াস করা হয় নাই, অন্য উপায় অবলম্বিত হইয়াছে (Joseph Hackin—Formulaire Sanskrit-Tibétain du Xe siècle, Paris, 1924)। ইহা কোথাকার উচ্চারণ? বাঙ্গালার অংশ-বিশেষেরই উচ্চারণ বলিয়া মনে হয়। কারণ অন্য কতকগুলি সংস্কৃত অক্ষরের উচ্চারণ যাহা দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির দ্বারা বাঙ্গালা দেশেরই বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়, —যথা—« ঋ »-র উচ্চারণ « রি », অন্তঃস্থ « ব »-এর অর্থাৎ [w β বা v]-র স্থলে বর্গীয় « ব » [b] পড়া, এবং « ক্ষ »-র উচ্চারণ « খ্য » রূপে লেখা।

সুতরাং, মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের উদৃশ অ-সংস্কৃত উচ্চারণ, সুপ্রাচীন যুগেই, বাঙ্গালা ভাষার মাতা- বা মাতামহী-স্থানীয়া প্রাকৃতের পূর্ব-বঙ্গে প্রচলিত রূপ-ভেদে আসিয়া থাকা অসম্ভব নহে।

§ ১৩। পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণের সহিত এই বিষয়ে আশ্চর্য মিল পাওয়া যায় ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের অনেকগুলি আধুনিক আর্য-ভাষায়—গুজরাটীতে, রাজস্থানীতে, দখ্‌নী-হিন্দুস্থানীতে এবং কতকগুলি পাহাড়ী ভাষায়; এবং § ১১-তে উল্লিখিত হ-কারের পরিবর্তনজাত কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-ধ্বনির সহযোগে স্বরের যে উদাত্ত-ভাব পূর্ব-বঙ্গে পাওয়া যায়, তদনুরূপ ব্যাপার পাঞ্জাবীতে-ও মিলে। এই সমস্ত বিষয় অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি (Recursives in Indo-Aryan প্রবন্ধ, Bulletin of the Linguistic Society of India, Lahore, 1929)। ভিন্ন ভিন্ন আধুনিক আর্য-ভাষায় এই প্রকারের সাদৃশ্য পৃথক্ পৃথক্ রূপে ও স্বাধীন ভাবে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়।

মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের এইরূপ বিপর্যয় বা বিকার আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষায় একটি লক্ষণীয় বিষয়; এবং এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান নিতান্ত আবশ্যক।